স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

নতুন দশ রহস্য

ভাষান্তর শিশির চক্রবর্তী

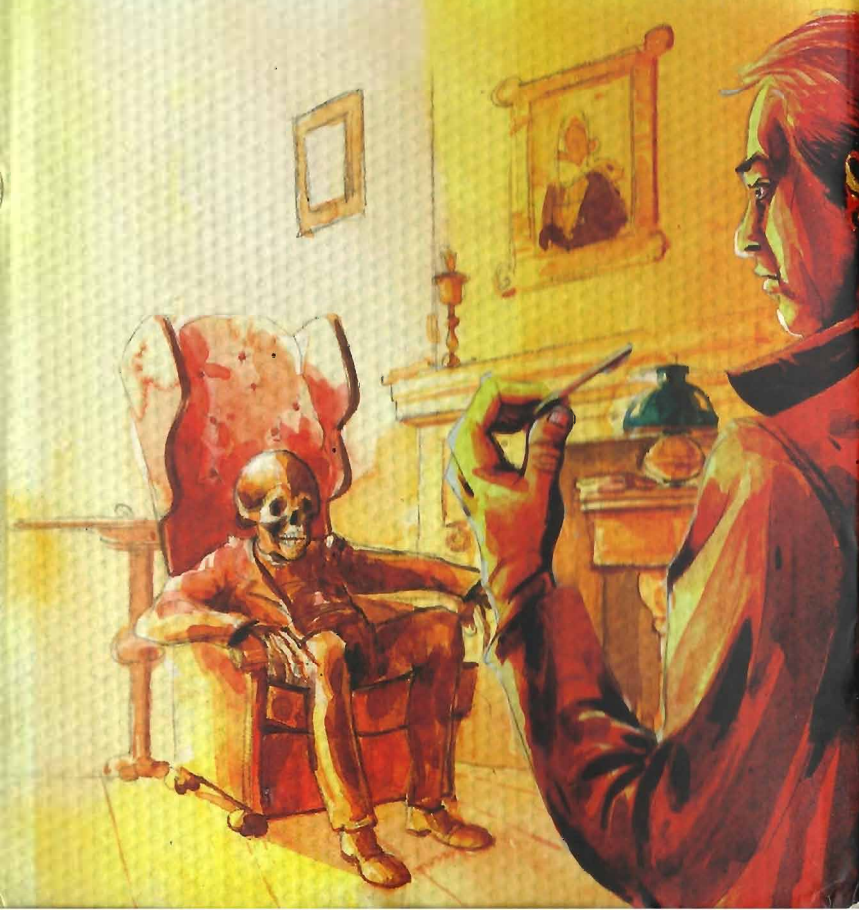

নতুন দশ রহস্য

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

শিশির চক্রবর্তীর জন্ম কলকাতায়, ১৯৫১ সালে। শিক্ষা কলকাতার হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে। ইংরেজি সাহিত্যের স্নাতক। কিন্তু কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছে ব্যাঙ্কে। সরকারি ও বেসরকারি ব্যাঙ্ক মিলিয়ে প্রায় চার দশক। তিরিশ বছরের ওপর কলকাতার বাইরে কাজ করেছেন, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। সদ্য অবসরপ্রাপ্তির পরে তিন জায়গা মিলিয়ে থাকার ইচ্ছে। কলকাতা, মুম্বাই ও শান্তিনিকেতন। ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্য পড়ে এবং হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সংগীত, রবীন্দ্রসংগীত ও স্বর্ণযুগের বাংলা গান শুনে কাটে অবসর। সংকলন করেছেন 'এ শুধু গানের দিন' নামের দু-খণ্ড আধুনিক বাংলা গানের সংগ্রহ। ভালোবাসেন ইংরেজি থেকে বাংলায় গল্প, ছড়া ইত্যাদি অনুবাদ করতে।

প্রচ্ছদ **ঋত্বিক রায়**

স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের চেয়ে শার্লক হোমস অনেক বেশি পরিচিত। অথচ ডয়েল-এর প্রথম ভালোবাসা ছিল অন্য ধারার লেখা। ইতিহাস ছাড়াও শার্লক হোমসকে সরিয়ে রেখে প্রায় ৭৬টি গল্প তিনি লিখে গেছেন, যেগুলি এককথায় অনবদ্য এবং আশ্চর্যভাবে অপরিচিত।

সেইসব অসম্ভব ভালো গল্পের খনি থেকে এই বইয়ে তুলে আনা হয়েছে দশটি সেরা রহস্য গল্পকে। প্রতিটি গল্পই বিষয়ের বৈচিত্র্যে, গা-ছমছম রহস্যে টানটান, এবং সবচেয়ে বড় কথা—কোত্থাও অনুবাদের বিন্দুমাত্র গন্ধ নেই। মনে হয়, যেন বাংলাতেই লেখা হয়েছিল গল্পগুলি। সাবলীল সৃজনের মুন্সিয়ানার কৃতিত্ব শিশির চক্রবর্তীর।

রহস্য গল্পের জাদুকর স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের 'নতুন দশ রহস্য' আদ্যোপান্ত না পড়ে ছাড়া যায় না।

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

নতুন দশ রহস্য

ভাষান্তর শিশির চক্রবর্তী

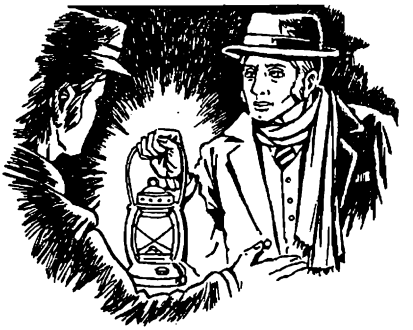

পত্র ভারতী

আমার স্বর্গতা মা-কে
যিনি গল্পের বই পড়তে
ভালোবাসতেন—

রূপে আর্থার কোনান ডয়েল

ডিটেকটিভ কাহিনিতে সৃষ্টি অনেক সময়েই স্রষ্টার সঙ্গে আমাদের মনের জায়গা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। আর্থার কোনান ডয়েল ও শার্লক হোমস্, আগাথা ক্রিস্টি ও এরক্যুল পোয়ারো, চেস্টারটন ও ফাদার ব্রাউন, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যোমকেশ বকসী, সত্যজিৎ রায় ও ফেলুদা— এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু শার্লক হোমস্-এর ব্যাপক পরিচিতি লেখক কোনান ডয়েলের অস্তিত্বকেও যেন ম্লান করে দিয়েছে। লন্ডনের বেকার স্ট্রিটে শার্লক হোমস্ (কোনান ডয়েল নয়) মিউজিয়মে গিয়ে দেখেছি, দেশ-বিদেশের বাচ্চারা রক্তমাংসের মানুষ ভেবে শার্লক হোমস্-কে এখনও চিঠি লেখে।

অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। পরিণত বয়সে কিছুটা আক্ষেপের সঙ্গেই কোনান ডয়েল বলতেন যে, তাঁর সবচেয়ে প্রিয় লেখাগুলি ঐতিহাসিক গল্প ও উপন্যাস, শার্লক হোমস্-কে নিয়ে লেখা ডিটেকটিভ কাহিনি নয়। কোনান ডয়েল বেঁচে ছিলেন একাত্তর বছর (১৮৫৯-১৯৩০)। ১৮৮৭ সালে 'এ স্টাডি ইন স্কারলেট' লিখে শার্লক হোমস্-কে প্রথম জনসমক্ষে হাজির করেন। বাকিটা ইতিহাস। পাঠকদের নিরন্তর তাগাদায় একের পর এক ডিটেকটিভ গল্প লিখে যেতে হয় কোনান ডয়েলকে। এমনকী আর শার্লক হোমস্-কে নিয়ে গল্প লিখবেন না মনস্থ করে একটি গল্পে হোমস্-এর মৃত্যু ঘটিয়ে নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু পাঠকদের দাবিতে হোমস্-কে বাঁচিয়ে তুলে আরও ডিটেকটিভ গল্প লিখতে হয় কোনান ডয়েলকে। এরই মধ্যে ১৮৯১ সালে তিনি লেখেন তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস।

আসলে ডিগ্রিধারী ডাক্তার হলেও কোনান ডয়েলের আগ্রহ ও নেশা ছিল বিভিন্ন বিষয়ে। তিনি ছিলেন একাধারে ডাক্তার, পরলোকতত্ত্ববিদ, দুঃসাহিক অভিযানে উৎসাহী এক পর্যটক, তিমি-শিকারি, যুদ্ধকালীন সাংবাদিক, ইতিহাস প্রেমিক, সমাজ সংস্কারক, ক্রীড়াবিদ। এই বহুবিধ বিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ প্রতিফলিত তাঁর নানাধারার লেখায়। লিখেছেন কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র প্রোফেসর চ্যালেঞ্জার। এসব ছাড়াও কোনান ডয়েল-এর একটি গল্প সংকলন আছে—যার ছিয়াত্তরটি গল্প বৈচিত্র্যে বিস্ময়কর। যুদ্ধ, অলৌকিক ঘটনা, জলদস্যু, মুষ্টিযুদ্ধ, চিকিৎসাশাস্ত্র, রহস্য—এইরকম সব বিষয়ের ওপর লেখা গল্পগুলি।

অ-শার্লকীয় কোনান ডয়েলের প্রতি আমার অনুরাগের প্রতিফলন এই সংকলনের দশটি অনূদিত গল্পে। গল্পগুলি 'কিশোর ভারতী' পত্রিকায় নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই, কোনান ডয়েলের বিচিত্র সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে আজকের কিশোর-কিশোরীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

'কিশোর ভারতী'-র সম্পাদক আমার অনুজপ্রতিম শ্রীত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আমার স্কুলের বন্ধু সাহিত্যিক শ্রীঅনীশ দেব (যার সাহিত্যচর্চার বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি অনেকটা কোনান ডয়েলের মতো)-এর তাড়নায় এই গল্পগুলির অনুবাদ করেছিলাম। এই সমগ্র প্রয়াসের জন্য যেটুকু কৃতিত্ব তার নায্য দাবিদার ত্রিদিব ও অনীশ। আর অনুবাদে যেটুকু দুর্বলতা বা অসম্পূর্ণতা তার দায় সম্পূর্ণভাবে আমারই।

মুম্বাই
৯ জানুয়ারি ২০১২

শিশির চক্রবর্তী

সূচিপত্র

বন্ধ ঘরের রহস্য ১১
কালো প্রাসাদের মালিক ৩৯
নিরুদ্দেশ ট্রেন ৬১
ক্যাভিয়ারের জার ৮৩
সেই হাতটা ১০১
প্রতিশোধ ১২১
মুষ্টিযুদ্ধ ১৩৯
দেবতার আংটি ১৫৭
অন্তর্ধান ১৭৭
ঘটনাটি ২০১

বন্ধ ঘরের রহস্য

ওকালতি আমার পেশা, কিন্তু অ্যাথলেটিক্‌স আমার নেশা। দশটা-পাঁচটা চার দেওয়ালের মধ্যে ব্যস্ত থাকার পর শারীরিক কসরত করার সময় পাই কেবল সন্ধেবেলায়। অফিসপাড়ার বদ্ধ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে যখন হ্যাম্পস্টেড বা হাইগেটের দিকে একটু উঁচু জায়গায় রাতের দিকে হাঁটতে যাই, তখন মুক্ত হাওয়া সেবনে শরীর মন দুই-ই তাজা হয়ে ওঠে। এইরকমই এক সন্ধেবেলা নিরুদ্দেশ-ভ্রমণে আমার সঙ্গে ফেলিক্স স্ট্যানিফোর্ডের প্রথম আলাপ হয়, আর এই আলাপ থেকেই আমার জীবনের সবচেয়ে রহস্যময় অভিজ্ঞতার আস্বাদ পাই।

মাসটা ছিল এপ্রিল বা মে, সাল ১৮৯৪। সেদিন হাঁটতে-হাঁটতে চলে গেছি লন্ডনের প্রায় উত্তরসীমানায়। রাস্তার দুদিকে গাছের সারি আর বাংলো বাড়ি। বসন্তকালের মনোরম সন্ধ্যা-আকাশ পরিষ্কার, চাঁদের আলোয় সবকিছুই সুন্দর লাগছিল। আমি তখন বহু মাইল হেঁটে ধীরেসুস্থে চারিদিক দেখতে-দেখতে ফেরা শুরু করেছি। এক মনে হাঁটছি—হঠাৎ একটা বাড়ির দিকে আমার নজর গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িটা বেশ বড়—রাস্তা থেকে একটু পেছিয়ে—সামনে বেশ কিছুটা ফাঁকা জমি। এমনিতে বাড়িটা আধুনিক ঢঙে বানানো কিন্তু আশপাশের বাড়ির তুলনায় জলুসহীন। রাস্তার ধারের বাড়িগুলো সবই একলাইনে দাঁড়িয়ে—শুধু এই বাড়িটার সামনের জায়গাটুকু খালি থাকায় বাড়িটাকে একটু বেখাপ্পা লাগছিল। নিশ্চয়ই কোনও বড়লোক ব্যবসায়ীর বাগানবাড়ি ছিল এটা—শহর হয়তো তখনও এতদূর এসে পৌঁছয়নি। ধীরে-ধীরে লন্ডন শহরের লাল ইটের বাড়ির অক্টোপাস এই অঞ্চলটুকুকেও গ্রাস করেছে। আরও কিছুদিনে হয়তো সেই অক্টোপাস বাড়িটার সামনের ফাঁকা জমিটুকুও হজম করে নেবে, আর এখানে মাথা তুলবে বছরে আশি পাউন্ড ভাড়ার একডজন ছোট-ছোট বাড়ি। আমি যখন এইসব ভাবছি তখন হঠাৎ-ই একটি ঘটনা আমার মনকে অন্যদিকে ঘোরাল।

ঘোড়ায় টানা চারচাকার একটা নড়বড়ে গাড়ি ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করতে-করতে দ্রুতবেগে ছুটে আসছিল, আর উলটোদিকে দেখা যাচ্ছিল একটা সাইকেলের মলিন আলো। চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া এই লম্বা রাস্তায় মাত্র দুটি বাহনই চলমান অবস্থায় ছিল। কিন্তু তবুও যেমন আটলান্টিকে অনেকসময় দুটো জাহাজে ধাক্কা লাগে, ঠিক তেমনই আশ্চর্য নিপুণতায় গাড়িটার সঙ্গে সাইকেলের লাগাল ধাক্কা। দোষটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাইকেল আরোহীরই। গাড়ির সামনে দিয়েই সে রাস্তা পার হতে গিয়েছিল, হিসেবে ভুল করে ঘোড়ার ধাক্কায় ছিটকে পড়ল রাস্তায়। উঠে দাঁড়িয়ে দাঁত খিঁচিয়ে সে তেড়ে গেল গাড়োয়ানের দিকে। তবে গাড়োয়ানও তাকে বেশ দু-চার কথা শুনিয়ে দিল। এই কথাকাটাকাটির ফাঁকে সাইকেল আরোহী ঘোড়ার গাড়ির নম্বরটা টুকে নিতে ভুলে গেল আর সেটা বুঝতে পেরেই গাড়োয়ান জোরে গাড়ি হাঁকিয়ে পিঠটান গেল। সাইকেল আরোহী পড়ে থাকা সাইকেলটা তুলতে গিয়ে হঠাৎ-ই বসে পড়ল আর যন্ত্রণায় অস্ফুটস্বরে আর্তনাদ করে উঠল। আমি ছুটে ওর কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'খুব লেগেছে?'

'মনে হচ্ছে, গোড়ালিটা মচকে গেছে—খুব ব্যথা। আপনার হাতটা একটু বাড়ান—ধরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি,' ও বলল।

সাইকেলের ম্লান আলোয় ওকে দাঁড় করাতে গিয়ে দেখলাম ভদ্রঘরের ছেলে। বয়স বেশি নয়। ছোট কালো গোঁফ আছে। চোখদুটি বড়—বাদামি রঙের, ভাঙা চোয়াল আর একটু নার্ভাস দেখতে। স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো নয়। হয় পরিশ্রম নয় দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে ওর ফ্যাকাশে মুখে। আমি ওর হাত ধরে টানতেই উঠে দাঁড়াল, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একটা পা মাটি থেকে তুলে নিল। ওই পা-টা নাড়াতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলেই যন্ত্রণার আওয়াজ করছিল।

'পা-টা মাটিতে ফেলতে পারছি না।' বলল ও।

'তুমি বয়সে অনেক ছোট। তোমাকে আর আপনি বলছি না। কোথায় থাকো।'

'এই তো, এই বাড়িতেই', বলে মাথা নেড়ে ওই বড়, অন্ধকার বাড়িটার দিকে দেখাল।

'রাস্তা পার হয়ে বাড়ির গেটে ঢোকার সময়েই হতভাগা ঘোড়ার গাড়িটা ধাক্কা মারল। আমায় একটু বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন?'

সহজেই তা করা গেল। প্রথমে ওর সাইকেলটা গেটের ভেতরে রাখলাম। তারপর ওকে ধরে কম্পাউন্ডের ড্রাইভ দিয়ে নিয়ে গিয়ে হলঘরের দরজার সামনে পৌঁছলাম। কোথাও একটুও আলো নেই—অন্ধকার। নৈঃশব্দের জন্য মনে হচ্ছিল, এই বাড়িতে কেউ কোনওদিন থাকেনি।

'ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ,' বলে ও দরজার তলায় চাবি লাগানোর চেষ্টা করল।

আমি বললাম, 'দাঁড়াও, আমি তোমাকে ঠিকমতো ঘরের ভেতর পৌঁছে দিই।'

ও মৃদু আপত্তি জানালেও এটা বুঝতে পারল যে, আমাকে ছাড়া ওর চলবে না।

দরজাটা খুলতেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা হলঘর। ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিকে হেলে গিয়ে এগিয়ে গেল। আমার হাত ওর বাহুতে। অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিতে-নিতে ও বলল, 'এই যে, ডানদিকের এই দরজাটা।'

আমি দরজাটা খুললাম আর তক্ষুনি ও কোনওরকমে একটা দেশলাই জ্বালাল। টেবিলের ওপর একটা বাতি ছিল। দুজনে মিলে সেটা জ্বালালাম।

'এখন আমি একদম ঠিক। আপনি যেতে পারেন। শুভরাত্রি,' এই বলে ও একটা চেয়ারে বসল এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে গেল।

আমি একটু দ্বিধায় পড়ে গেলাম। ছেলেটিকে এভাবে ছেড়ে যাই কী করে? ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, ও হয়তো মারাই গেছে। একটু পরে ওর ঠোঁটটা কেঁপে উঠল, বুকের একটু ওঠানামা দেখা গেল। কিন্তু ওর আধবোজা চোখদুটি একেবারে সাদা এবং ওর শরীর ফ্যাকাশে লাগছিল। আমার একার পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন, তাই ঘণ্টা বাজানোর দড়িটায় একটা টান দিলাম আর বহুদূরে ঘণ্টা বাজার আওয়াজ শুনতে পেলাম। কিন্তু কেউ এল না। আস্তে-আস্তে ঘণ্টার আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে গেল, অথচ কোনও মানুষের কথা বা পায়ের শব্দ শুনলাম না। একটু অপেক্ষা করে আবার ঘণ্টা বাজালাম, কিন্তু ফলের কোনও হেরফের হল না। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কেউ আছে—এই ছেলেটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চয়ই এত বড় বাড়িতে একা থাকে না। বাড়ির লোকদের ওর অবস্থা জানানো দরকার। তারা যদি ঘণ্টার আওয়াজে সাড়া না দেয়, আমাকেই তাদের খুঁজে বের করতে হবে। আমি বাতিটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে গেলাম।

যা দেখলাম, তা বিস্ময়কর। পুরো হলঘরটা খালি। সিঁড়িগুলো কার্পেটহীন ও ধুলোয় ঢাকা। দেখলাম তিনটে দরজা—তিনটে বড়-বড় ঘরে যাওয়ার। তিনটে ঘরেই কার্পেট বা পরদা নেই, ওপরে মাকড়সার জাল ও দেওয়ালে স্যাঁতাপড়া দাগ। নিস্তব্ধ শূন্য ঘরগুলোতে আমার পায়ের আওয়াজের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম। তারপর ভেতরের প্যাসেজ দিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোলাম—ওখানে অন্তত কাউকে পাওয়া যাবে। হয়তো আশপাশের কোনও ঘরে কেয়ারটেকারকে দেখতে পাব। কিন্তু কোথাও কেউ নেই—সব খালি। হতাশ হয়ে আর-একটি দালান ধরে এগোলাম—কিন্তু সেখানে অন্য বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

দালানটা শেষ হয়েছে একটা বড় বাদামি রঙের দরজার সামনে আর দরজার চাবির ফুটোর ওপর প্রায় পাঁচ শিলিং মুদ্রার মাপের একটা লাল মোমের সিল লাগানো। সিলটা নিশ্চয়ই বহুকাল আগের, কারণ সেটি বিবর্ণ হয়ে গেছে, তার ওপরে ধুলোর পলেস্তারা। দরজার দিকে তাকিয়ে ভাবছি ঘরের ভেতর কী থাকতে পারে, এমন সময় শুনলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ ডাকছে। দৌড়ে গিয়ে দেখি ছেলেটি চেয়ারে বসে আছে। ঘরে আলো না থাকাতে ও বেশ অবাক হয়ে গেছে।

'আপনি ঘরের বাতিটা নিয়ে কেন চলে গেছলেন?' ও জিগ্যেস করল।

'আমি লোকজন খুঁজছিলাম—তোমার সাহায্যের জন্য।'

'আমি এই বাড়িতে একা থাকি।'

'তোমার শরীর খারাপ হলে তো মুশকিল হয়ে যাবে।'

'হঠাৎ কেমন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। আসলে আমার মায়ের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে দুর্বল হার্ট পেয়েছি। ব্যথা পেলে বা আবেগবশত এরকম হয়। মনে হয় মায়ের মতো এতেই আমার মৃত্যু হবে। আপনি কি ডাক্তার?'

'না, উকিল। আমার নাম ফ্রাঙ্ক অল্‌ডার।'

'আমি ফেলিক্স স্টানিফোর্ড। ভালোই হল আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে। আমার বন্ধু মিঃ পার্সিভাল বলছিলেন, আমাদের শিগগিরই একজন উকিল লাগবে।'

'বেশ তো।'

'সেটা অবশ্য মিঃ পার্সিভালের ওপর নির্ভর করছে।' আচ্ছা, আপনি বাতি হাতে বাড়ির পুরো একতলাটা ঘুরে এলেন?'

'হ্যাঁ।'

'পুরোটা?' ও বেশ জোর দিয়ে জিগ্যেস করল আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

'তাই তো মনে হল। আশা করেছিলাম কাউকে-না-কাউকে পাবই।'

'সবক'টা ঘরে ঢুকেছিলেন কি?' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন।

'যে ক'টায় ঢুকতে পেরেছিলাম।'

'ও! তাহলে তো আপনি দেখেই ফেলেছেন!' এই বলে ও কাঁধটা ঝাঁকাল, ভাবটা এমন যে যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে।

'কী দেখে ফেলেছি?'

'ওই সিল করা দরজাটা।'

'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'ভেতরে কী আছে, জানতে ইচ্ছে করেনি, আপনার?'

'ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত লেগেছিল।'

'আচ্ছা, মনে করুন এই বাড়িতে আপনি বছরের-পর-বছর কাটিয়ে যাচ্ছেন আর ভাবছেন ওই দরজার ওপারে কী আছে, অথচ ঢুকে দেখছেন না। পারবেন এমন করে থাকতে?'

'কী, বলতে চাইছ তুমি? তুমি জানো না ওই ঘরে কী আছে?'

'আপনি যতটা জানেন, আমিও ঠিক ততটাই জানি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহলে দরজা খুলে দেখছ না কেন?'

'উপায় নেই', বলল ও।

ওর কথাবার্তায় একটা বিব্রত ভাব ছিল। হয়তো কোনও স্পর্শকাতর জায়গায় অজান্তে ঘা দিয়ে ফেলেছি। এমনিতে আমার সাধারণ শোকের মতো অহেতুক কৌতুহল কম, কিন্তু এখানের যা ব্যাপার, তাতে আমার কৌতুহল তীব্র হয়ে উঠেছে। যা হোক, এ-বাড়িতে আর বেশিক্ষণ থাকার কোনও অজুহাত আপাতত নেই, কেন না ছেলেটি প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে, আমি তাই উঠে পড়লাম।

'আপনার কি তাড়া আছে,' ও জিগ্যেস করল।

'না। আমার এখন এমন কিছু কাজ নেই।'

'তাহলে খানিকক্ষণ থাকুন না আমার সঙ্গে। আসলে একেবারে একা থাকি, কাজকর্মও কিছু নেই। লন্ডনে হয়তো এমন কোনও লোক পাবেন না যে আমার মতো জীবন কাটায়। কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগও তো পাই না।'

আমি ছোট ঘরটির চারিদিক দেখলাম। সাজানো-গোছানো বিশেষ নয়—একটা সোফা-কাম-বেড একদিকে রাখা। মাথায় ঘুরছে এই বিশাল শূন্য বাড়িটা আর বিশেষজ্ঞ ওই সিল লাগানো রহস্যময় দরজাটা। প্রায় অপ্রাকৃত একটা পরিবেশ। ইচ্ছে করছিল, আরও একটু খোঁজখবর নিই। হয়তো আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খানিকক্ষণ থাকলেই জানতে পারব আরও কিছু। ওকে বললাম যে, আমার কিছুক্ষণ থাকতে ভালোই লাগবে।

ও বলল, 'দেখুন, সাইড টেবিলে ড্রিংক্‌সের ব্যবস্থা আছে। আমি তো হাঁটতে পারছি না, সুতরাং হেল্প ইয়োরসেলফ। আর ট্রেতে চুরুট রাখা আছে। আমিও একটু চুরুট খাব। এবার বলুন—আপনি তো উকিল। মিঃ অলডার?'

'হ্যাঁ।'

'আর আমি কিছুই নই। পৃথিবীর চেয়ে অসহায় জীব আমি। লাখপতির সন্তান। বিশাল সম্পদ আমার আমার অধিকারে আসবে, এই আশায় বড় হয়েছি। আর দেখুন আজ আমি কী—কপর্দকহীন, সম্পূর্ণ বেকার। ভাগ্যের কী পরিহাস—আমি এই বিশাল বাড়ির মালিক, যে-বাড়ি ঠিকমতো রাখার সামর্থ্যও আমার নেই। ছোট এক চিলতে জমি গাধার বদলে ঘোড়া দিয়ে চাষ করানোর মতো হয়তো একটা কুঁড়েঘরই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

'তাহলে বাড়িটা বিক্রি করে দিচ্ছ না কেন?'

'সম্ভব নয়।'

'তা হলে ভাড়ায় দিয়ে দাও।'

'তারও উপায় নেই।'

আমার অবাক ভাব দেখে ও হাসল ঃ 'দাঁড়ান, আপনাকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি—অবশ্য যদি আপনার শুনতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো লাগে।'

'না-না, তুমি বলো।'

'আসলে আপনি আজ আমার যে-উপকারটা করলেন, তার সামান্য প্রতিদান হিসাবে অন্তত আপনার কৌতুহলটুকু তো মেটাতে পারি। আপনি হয়তো আমার বাবার নাম শুনে থাকবেন, বিখ্যাত ব্যাংকার স্ট্যানিস্‌লস স্ট্যানিফোর্ড।'

ব্যাংকার স্ট্যানিফোর্ডের নাম সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে পড়ল।

বছরসাতেক আগে হঠাৎ করে তাঁর দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া নিয়ে অনেক কেচ্ছা কেলেংকারি রটেছিল।

'বুঝতে পারছি আমার বাবার কথা আপনার মনে পড়েছে। বাবা তাঁর বেশ কিছু বন্ধুর টাকা ফাটকায় লাগিয়েছিলেন। সেই টাকা ডুবে যাওয়ায় বন্ধুদের এড়াতে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান।

'খুব নরমস্বভাবের সংবেদনশীল মানুষ ছিলেন বাবা, বন্ধুদের প্রতি দায়বদ্ধতার জন্য তিনি ভীষণ বিচলিত হয়েছিলেন, আইনত তিনি কোনও অপরাধ করেননি। কিন্তু পুরো ব্যাপারটায় তিনি এত মর্মাহত হয়েছিলেন যে, নিজের পরিবারের লোকেদেরও মুখ দেখাতে চাননি। পরে তিনি বিদেশ বিভুঁইয়ে মারা যান—কোথায় মারা যান তা-ও আমরা জানি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার বাবা মারা গেছেন!'

'আমার কাছে বাবার মৃত্যুর কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু ফাটকায় লগ্নী করা সেই টাকা আবার উদ্ধার হয়েছে। বেঁচে থাকলে উনি নিশ্চয়ই সসম্মানে ফিরে আসতেন। কিন্তু মনে হয় গত দু-বছরের মধ্যে কোনও একসময় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

'গত দু-বছরের মধ্যে কেন?'

'কেন-না দু-বছর আগেও তাঁর চিঠি পেয়েছি।'

'চিঠিতে উনি ওঁর ঠিকানা জানাননি?'

'চিঠিটা এসেছিল প্যারিস থেকে—কিন্তু কোনও ঠিকানা ছিল না। ওই সময়েই আমার মা মারা যান। তখনই বাবার চিঠিটা এসেছিল—আমাকে কিছু উপদেশ আর কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপর থেকে আর কোনও খবর নেই।'

'তার আগে কখনও বাবার খবর পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ এবং সিল লাগানো দরজার রহস্যের শুরু তখনই।' টেবিলটা একটু আমার দিকে ঠেলে দিন।

'এখানেই আমার বাবার চিঠিগুলো রাখা আছে। মিঃ পার্সিভাল ছাড়া আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই চিঠিগুলো দেখছেন।'

'কিছু মনে কোরো না, মিঃ পার্সিভাল কে?'

'উনি ছিলেন বাবার একান্ত সচিব এবং প্রথমে মায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও পরে আমার বন্ধু এবং উপদেষ্টা। মিঃ পার্সিভাল না থাকলে আমাদের যে কী অবস্থা হত, তা ভাবতেও পারি না। উনি ছাড়া বাবার চিঠিগুলো আর কেউ দেখেনি। এই দেখুন প্রথম চিঠি—সাত বছর আগে লেখা। দেশ ছাড়ার দিন। নিজেই পড়ে নিন।' চিঠিটা ফেলিক্সের মাকে লেখা ঃ

তোমাকে আমার ব্যাবসার ব্যাপারে কখনও কিছু বলিনি, কেন না ডঃ উইলিয়ম আমায় বলেছিলেন তোমার হার্ট খুব দুর্বল। কোনওরকম উত্তেজনা তোমার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক হবে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এমন যে, তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি।

আমার ব্যাবসার অবস্থা খুব খারাপ। এই কারণে আমি কিছুদিনের জন্যে তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তবে অবশ্যই যত শীঘ্র সম্ভব চলে আসব। আমাদের এই বিচ্ছেদ অতি অল্প সময়ের জন্য। সুতরাং এ নিয়ে ভেবে তুমি শরীর খারাপ কোরো না।

আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে। চেষ্টা কোরো কোনওমতেই যেন এই অনুরোধ পালনে কোনও অন্যথা না হয়। লনে যাওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্যাসেজে আমার যে ডার্করুমটা আছে, যেখানে আমার ফোটোগ্রাফির কাজ করি, সে-ঘরে এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলি আমি গোপন রাখতে চাই। তবে সেগুলির সঙ্গে কিন্তু কলঙ্কজনক কিছু জড়িয়ে নেই। তা সত্ত্বেও আমি চাই—তুমি বা ফেলিক্স অবশ্যই আমার এই অনুরোধ রাখবে। ফেলিক্সের বয়েস যখন একুশ বছর হবে, তখন ও ওই ঘরে ঢুকতে পারে, তা আগে নয়।

এখন তোমার কাছ থেকে বিদায় নিই। আমার এই অল্পদিনের অনুপস্থিতিতে যে-কোনও ব্যাপারে পরামর্শ নিতে গেলে মিঃ পার্সিভালের সঙ্গে যোগাযোগ কোরো। ওঁর ওপর আমার অগাধ আস্থা। তোমাকে আর ফেলিক্সকে এভাবে ছেড়ে যেতে খুব খারাপ লাগছে—কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি নিরুপায়।

ইতি—

৪ঠা জুন, ১৮৮৭ তোমার স্ট্যানিস্‌লস

আমার চিঠি পরা শেষ হলে ফেলিক্স খানিকটা কৈফিয়ত দেওয়ার সুরে বলল, 'আমাদের এই পারিবারিক ব্যাপার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোচনা করে হয়তো আপনার সময় নষ্ট করলাম। ধরে নিন, আপনি সবকিছু একজন ল'ইয়ার হিসেবে শুনলেন। অনেক বছর ধরে কাউকে এই কথাগুলো বলতে চাইছিলাম।'

'আমাকে বিশ্বাস করে এত কিছু বললে এতেই আমি খুশি। তা ছাড়া পুরো ব্যাপারটা বেশ কৌতূহল জাগায়।'

'জানেন, আমার বাবার সত্যের প্রতি আকর্ষণ ছিল এমনই যে, মাঝে-মাঝে সেটা প্রায় মানসিক রোগের পর্যায়ে চলে যেত। কখনও তিনি মিথ্যেকথা বলতেন না। সুতরাং তিনি যখন বলেছিলেন যে, মায়ের সঙ্গে শিগগিরই আবার দেখা করবেন এবং ডার্করুমে কোনও কলঙ্কজনক ব্যাপার নেই, বাবা নিশ্চয়ই সত্যি কথাই বলছিলেন।'

'তাহলে ওই ঘরে কী থাকতে পারে?'

'সেটা আমার বা মায়ের কল্পনার বাইরে। আমরা বাবার কথায় আমরা দরজায় সিল লাগিয়ে দিয়েছিলাম। এবং সেই সিল এখনও লাগানো। বাবার অন্তর্ধানের পর মা বছরপাঁচেক বেঁচে ছিলেন। যদিও ডাক্তাররা ভেবেছিলেন যে, মা বেশিদিন বাঁচবেন না। মায়ের হার্টের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছল। বাবার যাওয়ার পর প্রথম কয়েক মাসে মাকে লেখা বাবার দুটো চিঠি এসেছিল। দুটোই প্যারিস থেকে পোস্ট করা, কিন্তু কোনও ঠিকানা নেই। দুটো চিঠিই ছিল ছোট— বক্তব্য একই ঃ চিন্তা কোরো না, শিগগির দেখা হবে। এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে মায়ের মৃত্যু পর্যন্ত আর কোনও চিঠি আসেনি। তারপরে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন—তার বক্তব্য এতই ব্যক্তিগত যে, চিঠিটা আপনাকে দেখাতে পারছি না। চিঠিতে মোটামুটি বলেছিলেন, আমি যেন তাঁকে খারাপ মানুষ না ভাবি। আমায় অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। এ-ও বলেছিলেন যে, মায়ের মৃত্যুর পর ওই ঘরটার দরজা বন্ধ রাখার যৌক্তিকতা অনেক কমে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার একুশ বছর বয়েস না হওয়া অবধি ওই ঘর না খোলাই ভালো। ঘর খুললে অত্যন্ত বেদনাদায়ক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। বরং অপেক্ষা করলে সময়ের প্রভাবে ওই পরিস্থিতি সামলে নেওয়া সম্ভব হবে। আর বলেছিলেন, ওই ঘরের দায়িত্ব আমার ওপর থাকল। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, চরম দারিদ্র্য সত্ত্বেও এই বাড়ি আমি কেন বিক্রি করিনি বা ভাড়া দিইনি।

'বন্ধক তো রাখতে পারতে!'

'বাবা বাড়িটা আগেই বন্ধক রেখেছেন।'

'পুরো পরিস্থিতিটাই অদ্ভুত।'

'আমি আর আমার মা এতকাল আসবাবপত্র বিক্রি করে চালিয়েছি। চাকরবাকরদের একে-একে বিদায় করা হয়েছে। আপাতত, আমি এই একটা ঘরেই থাকি—আমাকে দেখাশোনা করারও কেউ নেই। তবে আর মাত্র দু-মাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপেক্ষা করতে হবে।'

'তার মানে?'

'আমার একুশ বছর বয়স হতে আর দু-মাস বাকি। তার পরেই প্রথম কাজ ওই ঘরের দরজাটা খোলা, আর দ্বিতীয় কাজ বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়া।'

'আচ্ছা, ফাটকায় লাগানো টাকা যখন উদ্ধার হয়েই গেছল, তখন তোমার বাবা ফিরে এলেন না কেন?'

'বাবা নিশ্চয়ই ততদিনে গত হয়েছিলেন।'

'আচ্ছা, তুমি বললে দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে তোমার বাবা আইনত দণ্ডনীয় কোনও অপরাধ করেননি।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তোমার মাকে সঙ্গে নিয়ে যাননি কেন?'

'জানি না।'

'নিজের ঠিকানা গোপন করার কারণ কী হতে পারে?'

'তা-ও বলা কঠিন।'

'মা মারা গেলেন, তাঁর শেষকৃত্যও হয়ে গেল—তবুও তোমার বাবা কেন ফিরে এলেন না?'

'জানি না।'

'দ্যাখো, একজন পেশাদার উকিল হিসেবে তোমাকে এটুকু বলতে পারি যে, তোমার বাবার দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পেছনে অবশ্যই কোনও গুরুতর কারণ ছিল। যদিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অপরাধের প্রমাণ ছিল না। তিনি হয়তো জানতেন কোনও প্রমাণ পাওয়া গেলে ব্যাপারটা থানা-আদালত অবধি গড়াতে পারে। সুতরাং তিনি দেশের বাইরে চলে যাওয়াই সমীচীন মনে করেন। এ ছাড়া তো আর কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাচ্ছি না।'

ফেলিক্স স্বভাবতই একটু ক্ষুণ্ণ হল। আমায় ঠান্ডা গলায় বলল, 'আপনি আমার বাবাকে চিনতেন না। যখন আমাদের ছেড়ে যান, তখন আমি খুবই ছোট। কিন্তু বিশ্বাস করুন, বাবাই আমার আর্দশ। বাবার দোষ ছিল একটাই, তিনি একটু স্পর্শকাতর মানুষ ছিলেন। আর নিজের স্বার্থ নিয়ে কখনও ভাবেননি। তাঁর মাধ্যমে কারুর আর্থিক ক্ষতির কথা তিনি ভাবতেই পারতেন না। তাঁর আত্মসম্মানবোধও ছিল অত্যন্ত প্রখর। সুতরাং তাঁর অন্তর্ধানের কারণ খুঁজতে গিয়ে তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো ভুলে গেলে চলবে না।'

'কিছু মনে কোরো না—আমি তো বাইরের লোক, একটা নিরপেক্ষ মত দিলাম, এই মাত্র। যাক্, এবার উঠি, অনেকটা হাঁটতে হবে এখন। সমস্ত ঘটনাটা এমনই যে, এর শেষটুকু জানার কৌতূহল থাকবে।'

'আপনার কার্ডটা রেখে যান,' বলল ফেলিক্স।

কার্ড রেখে শুভ রাত্রি জানিয়ে রওনা দিলাম।

বেশ কিছুকাল আর কোনও খবর পেলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ একদিন দুপুরে আমার অফিসে বেয়ারা একটা কার্ড দিয়ে গেল—একজন মিঃ জে. এইচ. পার্সিভাল আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। একটু পরেই ঘরে ঢুকলেন তিনি—বয়েস বছর পঞ্চাশেক, ছোটখাটো চেহারা। চোখদুটো কিন্তু উজ্জ্বল।

'ফেলিক্স স্ট্যানিফোর্ডের কাছে আমার নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন,' উনি বললেন।

'অবশ্যই। আমার মনে আছে,' বললাম।

'ফেলিক্স আপনাকে ওর বাবার অন্তর্ধান এবং একটা সিল করা ঘরের কথা বলে থাকবে।'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে আপনি নিশ্চয় জানেন যে, ফেলিক্সের একুশ বছর বয়েস হলে ওই ঘরটা খোলার অনুমতি দিয়েছিলেন ওর বাবা।'

'জানি।'

'আজই ফেলিক্সের বয়স একুশ হল।'

'ঘরটা খুলেছেন?' উৎসাহের সঙ্গে জিগ্যেস করলাম।

'এখনও খুলিনি,' গম্ভীরভাবে বললেন মিঃ পার্সিভাল।

'আমার মনে হয় দরজাটা খোলা সময় একজন সাক্ষী উপস্থিত থাকা দরকার। আপনি সাক্ষী হিসাবে থাকতে রাজি?'

'সানন্দে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দিনের বেলা আপনি আর আমি দুজনেই ব্যস্ত। রাত ন'টায় যদি আমরা ওই বাড়িতে পৌঁছই?'

'নিশ্চয়ই আসব।'

'ওই কথাই রইল। আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করব,' এই বলে মিঃ পার্সিভাল বিদায় নিলেন।

রাতে পৌঁছলাম ওই বাড়িতে। ফেলিক্সের ছোট ঘরটিতে ওরা দুজনে আমার অপেক্ষায় বসেছিলেন। ফেলিক্সকে স্বাভাবিকভাবেই বেশ নার্ভাস লাগছিল। কিন্তু মিঃ পার্সিভালের বিশেষ উত্তেজিত ভাব দেখে অস্বাভাবিক লাগল, ওঁর মুখ লালচে। হাতগুলো অস্থিরভাবে নড়াচড়া করছে।

ফেলিক্স আমাকে দেখে বিশেষ খুশি হয়ে ধন্যবাদ জানাল। তার পরেই সে বলল পার্সিভালকে, 'আর দেরি করে কী লাভ? চলুন, যা হওয়ার তাড়াতাড়ি হয়ে যাক।'

পার্সিভাল বাতিটা হাতে নিয়ে আগে চললেন। কিন্তু দরজাটার কাছে পৌঁছনোর আগেই প্যাসেজে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওঁর হাত এত কাঁপছিল যে, বাতির আলোর ছায়া দেওয়ালে ওঠানামা করছিল।

একটু ভাঙা গলায় পার্সিভাল বললেন, 'মিঃ স্ট্যানিফোর্ড, আপনি মন শক্ত করুন। সিল ভেঙে দরজা খোলার পর যাতে কোনও মানসিক আঘাত না পান।'

'কী থাকতে পারে ওই ঘরে, পার্সিভাল? আপনি কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলছেন আমি ভয় পাব?'

'না, মিঃ স্ট্যানিফোর্ড। কিন্তু আমাদের তৈরি থাকা দরকার...মন শক্ত করা চাই...আপনার যাতে কিছু...,' পার্সিভাল শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে অতিকষ্টে টুকরো-টুকরো কথাগুলি বলছিলেন। তখনও আমি স্পষ্ট বুঝলাম যে, পার্সিভাল জানেন ওই ঘরে কী আছে এবং যা আছে তা ভয়ানক, বীভৎস।

'মিঃ স্ট্যানিফোর্ড, এই নিন চাবি। কিন্তু আমার সতর্কবাণী মনে রাখবেন,' বললেন পার্সিভাল।

পার্সিভালের হাত থেকে চাবির গোছাটা ফেলিক্স ছিনিয়ে নিল। তারপর বিবর্ণ সিলটির নীচে একটা ছুরি ঢুকিয়ে এক ঝটকায় সিলটি উঠিয়ে ফেলল। বাতিটা পার্সিভালের হাতে কাঁপছে, তাই আমি বাতিটা আমার হাতে নিয়ে চাবির ফুটোর ওপর আলো ফেললাম। আর ফেলিক্স একটার-পর-একটা চাবি দিয়ে দরজাটা খোলার চেষ্টা করতে লাগল।

হঠাৎ একটা চাবি লেগে গেল আর দরজাটা এক ধাক্কায় খুলে গেল। আর তার পরেই ফেলিক্স ঘরের ভেতরে এক-পা গিয়েই একটা আর্তচিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে আমাদের পায়ের কাছে পড়ে গেল।

আমিও যদি পার্সিভালের সতর্কবাণী না শুনতাম বা ভয়াবহ কিছু সহ্য করার জন্য তৈরি না থাকতাম, বাতিটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়তো আমার হাত থেকে পড়ে যেত। ঘরটায় কোনও জানালা বা আসবাবপত্র নেই। একটা ফটোগ্রাফিক ল্যাবরেটরির মতো সাজানো—একপাশে একটা সিংক ও তাতে একটা কল লাগানো। একটা তাকে কিছু শিশি বোতল রাখা। এবং ঘরের মধ্যে তীব্র, অস্বস্তিকর একটা গন্ধ—কিছুটা কেমিক্যালের, কিছুটা জান্তব। আমাদের সামনে একটা টেবিল ও চেয়ার রাখা আছে। আমাদের দিকে পেছন ফিরে একজন ওই চেয়ারে বসে কিছু যেন লিখছে। মানুষটির দেহরেখা ও ভঙ্গী একদম জীবন্ত মানুষের মতো, কিন্তু তার ওপর আলো পড়তেই আতঙ্কে আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। লোকটির ঘাড় আমার কবজির মতো সরু। ঘাড়ের চামড়া কোঁচকানো কালো। তার শরীরের ওপর ধুলোর পুরু প্রলেপ—ঘন, হলদেটে ধুলো। চুল, কাঁধ, হলদে কুঁচকে যাওয়া হাত—সবেতেই ধুলোর প্রলেপ। মাথাটি ঝুঁকে বুকের ওপর। তার কলমটি একটি বিবর্ণ কাগজের ওপর পড়ে আছে।

'হায়! মিঃ স্ট্যানিফোর্ড, আমার মালিক!' পার্সিভাল এই বলে কেঁদে উঠলেন এবং তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

'ইনিই মিঃ স্ট্যানিস্‌লস স্ট্যানিফোর্ড!' আমি অবাক বিস্ময়ে বললাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এইখানে উনি সাতবছর বসে আছেন—সাত-সাতটি বছর! কেন এমন করলেন উনি? কত অনুরোধ করেছি, পায়ে ধরেছি—তা-ও আমার কথা শোনেননি। দেখুন টেবিলে একটা চাবি পড়ে আছে। ভেতর থেকে দরজায় চাবি লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ওই দেখুন, কিছু লিখে রেখেছেন। ওটা দেখতে হবে।'

'হ্যাঁ, ওই কাগজটা নিয়ে নিন আর, ভগবানের দোহাই, এই ঘর থেকে বেরিয়ে আসুন,' আমি বললাম। 'এই ঘরের হাওয়া বিষাক্ত। আসুন, স্ট্যানিফোর্ড, বেরিয়ে আসুন! আতঙ্ক বিহ্বল ফেলিক্স স্ট্যানিফোর্ডের দু-হাত দুজনে ধরে ওকে কিছুটা টানতে-টানতে, কিছুটা বয়ে নিয়ে আমরা ওর ঘরে চলে এলাম।

জ্ঞান ফিরে এলে ফেলিক্স বলল, 'উনিই আমার বাবা! মৃত অবস্থায় চেয়ারে বসে! পার্সিভাল, আপনি নিশ্চয় সবকিছু জানতেন! তাই আপনি ওই ঘরে ঢোকার আগে আমাকে সতর্ক করেছিলেন।'

'হ্যাঁ, মিঃ স্ট্যানিফোর্ড, আমি জানতাম। আমি ভালো ভেবেই সবকিছু করেছি। কিন্তু আমার অবস্থাটা একটু বিবেচনা করে দেখুন—সাত বছর ধরে আমি জানি আপনার বাবা ওই ঘরে মরে পড়ে আছেন!'

'আপনি সবকিছু জেনেও আমাদের কিছু বলেননি!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার ওপর রাগ করবেন না, মিঃ স্ট্যানিফোর্ড। আবার বলি, এই ঘটনায় আমার ভূমিকাই সবচেয়ে কঠিন ছিল।'

'আমার মাথা ঘুরছে। কিছুই বুঝতে পারছি না!' এই বলে ফেলিক্স টলতে-টলতে গিয়ে বোতল থেকে খানিকটা ব্র্যান্ডি খেল ঃ 'আমার মাকে ও আমাকে লেখা বাবার চিঠিগুলো কি তা হলে জাল?'

'না। চিঠিগুলো আপনার বাবাই লিখেছিলেন এবং আপনাদের ঠিকানাও ওঁরই হাতে লেখা। আমাকে ওগুলো দিয়েছিলেন ডাকবাক্সে ফেলার জন্য। আপনার বাবা আমার মালিক ছিলেন। এবং কর্মচারী হিসেবে তাঁর আদেশ আমি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছি।'

ততক্ষণে ব্র্যান্ডির প্রভাবে ফেলিক্স একটু সুস্থ হয়েছে। ও বলল, 'এবার বলুন। হয়তো এখন সহ্য করতে পারব।'

'মিঃ স্ট্যানিফোর্ড, আপনি তো জানেন একটা সময়ে আপনার বাবা বিশেষ বিপদে পড়েন। উনি ভেবেছিলেন, অনেকের কষ্টার্জিত সঞ্চয় ওঁর গাফিলতির ফলে ডুবতে বসেছে। তখন উনি আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। মিঃ স্ট্যানিফোর্ড, আপনি ভাবতেও পারবেন না আপনার বাবার এই সিদ্ধান্ত বদলানোর জন্য আমি কী না করেছি—অনুরোধ, উপরোধ, জবরদস্তি। কিন্তু তিনি মনস্থির করে ফেলেছিলেন। আমাকে শুধু বলেছিলেন যে, ওঁর মৃত্যুটা সহজ না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেদনাদায়ক হবে, সেটা নির্ভর করছে আমার ওপর। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ওঁর কথার নড়চড় হবে না। শেষপর্যন্ত আমাকে মেনেই নিতে হয় ওঁর অনুরোধ, আর ওঁর কথামতো সবকিছু করতে রাজি হলাম।

'ওঁর চিন্তার কারণ ছিল একটাই। লন্ডনের ডাক্তার ওঁকে বলে দিয়েছিলেন। ওঁর স্ত্রীর হৃদযন্ত্র খুবই দুর্বল এবং সামান্য মানসিক আঘাতেই তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। স্বামী হিসাবে উনি এমন কিছু করতে চাননি যাতে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। এদিকে নিজের জীবনও তাঁর কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। কী করে স্ত্রীর কোনওরকম ক্ষতি না করে নিজের জীবন শেষ করা যায়, এই ছিল তার লক্ষ্য।

'আপনি এখন নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন উনি কী রাস্তা নিয়েছিলেন। আপনার মা যে চিঠি পান, সেটা আপনার বাবারই লেখা। চিঠিতে যা লেখা ছিল, তা সবই সত্য। উনি লিখেছিলেন যে, আপনার মায়ের সঙ্গে শিগগিরই ওঁর দেখা হবে। তার মানে উনি কয়েক মাসের মধ্যেই আপনার মায়ের মৃত্যুর সম্ভাবনার ইঙ্গিত করছিলেন। আপনার মায়ের আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে উনি এত নিশ্চিত ছিলেন যে, আপনার মাকে দুটো মাত্র চিঠি লিখে যান—কিছুদিনের ব্যবধান রেখে পাঠানোর জন্য। কিন্তু আপনার মা পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন আর তাঁকে পাঠানোর জন্য আর কোনও চিঠি ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনার বাবা আর-একটা চিঠি লিখে গেছলেন, যেটা আপনার মায়ের মৃত্যুর পর আপনাকে পাঠাতে বলেছিলেন। এই তিনটে চিঠিই আমি প্যারিসে গিয়ে ডাকবাক্সে ফেলি, যাতে সকলেই নিঃসন্দেহ হয় যে, আপনার বাবা বিদেশে আছেন। উনি আমাকে বলে গেছলেন কাউকে কিছু না জানাতে, তাই আমি চুপ করে থেকেছি। আমি তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলাম। উনি ভেবেছিলেন, সাত বছর পরে ওঁর মৃত্যুর খবর পেলে ওঁর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন শোকটা অনেক সহজেই সামলে নেবে। উনি সর্বদা আর সবাইয়ের সুযোগ সুবিধে ভেবে কাজ করতেন।'

আমরা চুপচাপ এতক্ষণ পার্সিভালের কথা শুনছিলাম। নৈঃশব্দ ভেঙে প্রথম কথা বলল ফেলিক্স, 'আপনার কোনও দোষ নেই, পার্সিভাল। আপনি আমার মাকে মানসিক আঘাত থেকে রক্ষা করেছেন, এবং তাই উনি আর ক'টা বছর বেঁচে ছিলেন। ওই কাগজটা কী?'

'আপনার বাবার মৃত্যুর সময়ে এইটাই লিখছিলেন। পড়ে শোনাব?'

'পড়ুন।'

বিষটা খেয়েছি এবং বুঝতে পারছি তা
আমার শিরায়-শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে। অনুভূতিটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অদ্ভুত। কিন্তু কোনও যন্ত্রণা নেই। আমার ইচ্ছা অনুযায়ী যদি সবকিছু করা হয়, তা হলে এই লেখা যখন কেউ পড়বে, ততদিনে আমার মৃত্যুর পর কয়েক বছর কেটে যাবে। আমার কাছে যারা লগ্নীর জন্য টাকা দিয়েছিল, তারা এতদিনে নিশ্চয়ই আমার প্রতি তাদের বিরুপতা ভুলে গিয়ে থাকবে। আর, ফেলিক্স, তুমিও এই পারিবারিক কলঙ্কের জন্য আমায় ক্ষমা কোরো। ঈশ্বর আমার এই ক্লান্ত আত্মাকে বিশ্রাম দিন।

আমরা তিনজনেই একসঙ্গে বলে উঠলাম 'তাই হোক।'

'The Sealed Room' গল্পের অনুবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালো প্রাসাদের মালিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুশো বছরেরও আগের কথা। জার্মান সেনাদল ফ্রান্সে ঢুকে পড়েছে এবং প্যারি শহরকে তারা ঘিরে ফেলেছে উত্তরে ও দক্ষিণে। ফরাসি সৈনারা তাড়া খেয়ে ফ্রান্সের উত্তরদিকে চলে যাচ্ছে। জার্মানরা ধীরে-ধীরে ফ্রান্সের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

পরাজয়ের অপমান ও গ্লানিতে ফরাসি নাগরিকরা মুহ্যমান। পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ—সব ধরনের সেনাদের চেষ্টা ব্যর্থ করে ফ্রান্স অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের মুখোমুখি। দল বেঁধে লড়াইয়ে ফরাসিরা জার্মানদের থেকে কম দক্ষ হলেও, চোরাগোপ্তা একক যুদ্ধে ফরাসিরা নিপুন। তাই প্রকাশ্য যুদ্ধের বাইরেও আর এক ধরনের যুদ্ধ চলতে লাগল—ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিহিংসার যুদ্ধ। জার্মানরা একজন ফরাসিকে হত্যা করলেই আর এক ফরাসি তার প্রতিশোধ নিতে লাগল।

জার্মানির এক সেনাধিকারী কর্নেল ফন গ্রাম এইরকম চোরাগোপ্তা আক্রমণে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর পদাতিক সেনাদল তখন নর্মান্ডির একটা ছোট শহরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশপাশে ছোট-ছোট গ্রাম আর খামারবাড়ি। ফরাসি সেনাদের কোনও চিহ্ন নেই কোথাও। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিদিন সকালে খারাপ খবর আসত—হয় কোনও জার্মান সান্ত্রীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে, কিংবা জার্মান সেনাদের কোনও ছোট দল নিখোঁজ।

এইরকম খবর পেলেই কর্নেল রেগে গিয়ে গ্রামের কিছু বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিতেন। নিরীহ গ্রামবাসীরা ভয়ে কাঁপত। কিন্তু পরদিন সকালে আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

এই অদৃশ্য শত্রুকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল, অপরাধের উৎস একটাই। কেন না জার্মান সেনাদের হত্যা বা নিখোঁজ করা হচ্ছিল একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতেই।

গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়েও অপরাধের কোনও সূত্র পাওয়া গেল না। তখন বাধ্য হয়েই কর্নেল ফন গ্রাম অপরাধীকে ধরে দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করলেন।

প্রথমে পাঁচশো ফ্রাংক, তারপরে আটশো ফ্রাংক পুরস্কার ঘোষণা করেও কোনও লাভ হল না। গ্রামবাসীরা কেউই প্রলোভনের ফাঁদে পা দিল না।

শেষে একজন পদস্থ জার্মান সেনাধিকারীর হত্যার পর পুরস্কারের অঙ্ক বাড়িয়ে করা হল এক হাজার ফ্রাংক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার আশার আলো দেখা গেল। ফ্রাঁসোয়া নামের এক কৃষি শ্রমিক আর লোভ সামলাতে পারল না।

নীল পোশাক পরা, ক্ষয়াটে মুখের ফ্রাঁসোয়ার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—তুমি ঠিক জানো অপরাধী কে?

—হ্যাঁ, হুজুর।

—অপরাধীর নাম?

—হুজুর, ওই এক হাজার ফ্রাংক—

—যতক্ষণ না তোমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে, এক পয়সাও পাবে না। এবার বলো! আমাদের লোকদের কে হত্যা করছে?

—ওই কালো প্রাসাদের মালিক কাউন্ট ইউস্তাস!

—মিথ্যে কথা! অভিজাত সম্প্রদায়ের একজন ভদ্রলোক কখনই এই জঘন্য অপরাধ করতে পারেন না।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফ্রাঁসোয়া বলল,—বুঝতে পারছি আপনি কাউন্টকে চেনেন না। আমি যা বলছি তা সত্যি। আপনি নির্দ্ধিধায় খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। কাউন্ট ইউস্তাস এমনিতেই কড়া ধাতের মানুষ। কিন্তু একমাত্র সন্তানের মৃত্যুর পর থেকে উনি ভয়ংকর হয়ে উঠেছেন। তাঁর ছেলে যুদ্ধের সময় জার্মান সেনাদের হাতে ধরা পড়েছিল। জার্মানি থেকে পালাবার সময় তার মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাউন্ট উন্মাদের মতো হয়ে যান। নিজের প্রজাদের সঙ্গে নিয়ে জার্মান সৈন্যদের নিয়মিত অনুসরণ করেন। জানি না কতজন জার্মানকে আজ পর্যন্ত মেরেছেন। মৃতদের কপালে ছুরি দিয়ে কেটে তৈরি করা যে ক্রশটা দেখা যায়, সেটা কাউন্টের বংশের চিহ্ন।

কথাটা সত্যি। প্রত্যেক মৃত জার্মানের কপালে ক্রুশ চিহ্ন পাওয়া গেছে। কর্নেল একটু ঝুঁকে পড়ে টেবিলের ওপর রাখা ম্যাপটার ওপর আঙুল বুলিয়ে বললেন,—প্রাসাদটাতো কাছেই।

—হ্যাঁ, হুজুর। এখান থেকে মাত্র সাড়ে তিন মাইল।

—তুমি জায়গাটা চেনো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তো ওখানেই কাজ করতাম।

কর্নেল বেল বাজিয়ে একজন সার্জেন্টকে ডেকে বললেন, —এই লোকটাকে কিছু খেতে দাও, আর আপাতত একে আটকে রাখো।

—কেন হুজুর, আমাকে আটকে রাখবেন কেন? আমি তো আর কিছুই জানি না।

—তোমাকে আমরা গাইড হিসেবে চাই।

—কিন্তু কাউন্ট ইউস্তাস যদি আমাকে দেখতে পান, যদি তাঁর হাতে পড়ি—দোহাই হুজুর—

ফ্রাঁসোয়াকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সার্জেন্টকে ইশারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন কর্নেল। সেইসঙ্গে বললেন, ক্যাপ্টেন বাউমগার্টেনকে এক্ষুনি আমার কাছে পাঠাও।

ক্যাপ্টেন বাউমগার্টেন তক্ষুনি এলেন। তিনি মাঝবয়েসি। চোয়াল চওড়া, চোখ দুটো নীল, হলদেটে গোঁফ আর পোড়া ইটের মতো লাল মুখের রং। মাথায় চুল নেই। মাথার চামড়াটা টানটান আর এত উজ্জ্বল যে তা আয়নার মতো লাগে। একটু ধীরপ্রকৃতির লোক হলেও ক্যাপ্টেন খুব সাহসী আর নির্ভরযোগ্য। কর্নেলের তাই বিশেষ আস্থা বাউমগার্টেনের ওপর।

—ক্যাপ্টেন, তুমি আজ রাতেই ওই কালো প্রাসাদে চলে যাও। একটা গাইড দিয়ে দিচ্ছি। তুমি কাউন্ট ইউস্তাসকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে। কোনওরকম প্রতিরোধের চেষ্টা করলে তৎক্ষণাৎ গুলি চালাবে।

ক'জন লোক নিয়ে যাব, কর্নেল?

—দেখো। চারদিকে তো গুপ্তচর! কাউন্ট কিছু বোঝা বা জানার আগেই তার ওপর হামলা করা দরকার। বেশি লোক না নিলেই ভালো।

—ঠিক আছে, জনা কুড়ি লোক নিলেই হবে। আর উত্তরদিকে যাওয়ার ভান করে ম্যাপে দেখানো এই রাস্তায় হঠাৎ ঢুকে পড়বে। তাতে কেউ কিছু বোঝার আগেই কালো প্রাসাদে পৌঁছনো যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—বেশ। কাল সকালেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে—বন্দিসহ।

ডিসেম্বরের ওই শীতের রাতে ক্যাপ্টেন বাউমগার্টেন কুড়ি জন সৈনিক নিয়ে উত্তর- পশ্চিম দিকে বড় রাস্তা ধরে রওনা হলেন। দু-মাইল গিয়েই দলটি ঢুকে পড়ল একটা সরু মেঠো রাস্তায়। ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছিল। পপলার গাছ আর দু-পাশের খেতের মধ্যে থেকে ভেসে আসছিল বৃষ্টি আর হাওয়ার শব্দ।

ক্যাপ্টেনের পাশেই হাঁটছিল সার্জেন্ট মোসার। সার্জেন্টের কবজির সঙ্গে ফ্রাঁসোয়ার একটা হাত বাঁধা। ফ্রাঁসোয়ার কানে-কানে বলে দেওয়া হয়েছে, এই দলের ওপর কোনও অতর্কিত আক্রমণ হলে প্রথম গুলিটা তার মাথায় ঢুকবে। পেছনে-পেছনে হাঁটছিল দলের বাকি সেনারা। নরম ভেজা মাটিতে তাদের জুতোর শপশপ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। গন্তব্য, উদ্দেশ্য এসবই তাদের জানা এবং সাথীদের মৃত্যুর বদলা নেওয়ার সুযোগ পেয়ে তারা সকলেই উদ্দীপ্ত।

রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ ফ্রাঁসোয়া সবাইকে নিয়ে এসে থামল দুটো বড় থাম লাগানো একটা প্রকাণ্ড লোহার গেটের সামনে। গেটের সঙ্গে লাগানো পাঁচিল মাঝে-মাঝেই ভেঙে গেছে। চারপাশে আগাছা আর কাঁটাঝোপ। ভাঙা পাঁচিলের মধ্য দিয়ে কম্পাউন্ডে ঢুকে পুরো দলটা ওক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাছের ছায়ার নীচে লুকিয়ে এগিয়ে গেল প্রাসাদের দিকে।

কালো রঙের প্রকাণ্ড প্রাসাদ। বর্ষাকালের ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে প্রাসাদের ওপর একটা আলো-আঁধারি পরিবেশ তৈরি করেছে। প্রাসাদের আকৃতি অনেকটা ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মতো। সামনে খিলান দেওয়া একটা নীচু দরজা। আর দেওয়াল জুড়ে জাহাজের জানলার মতো ছোট-ছোট জানলা। ছাদের কিছু-কিছু অংশ কোণার দিকে ভেঙে পড়েছে।

একতলার একটা জানলায় আলো দেখা যাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন নীচু গলায় আদেশ দিয়ে দলের লোকদের বাড়িটার বিভিন্ন দিকে পাহারা দিতে পাঠালেন। তিনি আর সার্জেন্টে পা টিপে-টিপে জানলার কাছে গিয়ে উঁকি মারলেন ভেতরে।

ঘরটা ছোট, আসবাব সামান্যই। সাধারণ কাজের লোকের পোশাক পরা একজন বয়স্ক লোক একটা কাঠের চেয়ারে বসে মোমবাতির আলোয় একটা ছেঁড়া কাগজ পড়ছিল। পা দুটো সামনে একটা বাক্সের ওপর তোলা। পাশেই টুলের ওপর একটা মদের বোতল ও গেলাস। জানলার মধ্যে দিয়ে বন্দুক ঢোকাতেই লোকটা ভয়ে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল।

—একদম চুপ! পুরো বাড়ি আমরা ঘিরে ফেলেছি। পালানোর কোনও রাস্তা নেই। এসে দরজাটা খুলে দাও,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাহলে আমরা জোর করে ভেতরে ঢুকব।

—গুলি চালাবেন না! এক্ষুনি দরজা খুলে দিচ্ছি।

একটু পরেই পুরোনো তালা খোলার ও দরজার হুড়কো সরানোর আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল আর কয়েকজন জার্মান সৈন্যকে নিয়ে ক্যাপ্টেন বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

—এই প্রাসাদের মালিক কাউন্ট ইউস্তাস কোথায়?

—মালিক তো এখন নেই। বাইরে গেছেন।

—এত রাতে বাইরে? মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাওনি?

—সত্যি বলছি উনি বাড়িতে নেই।

—কোথায় গেছেন?

—জানি না।

—কী করতে গেছেন?

—জানি না।...স্যার, পিস্তলটা আমার দিকে ওভাবে তাক করবেন না। আপনারা আমায় মেরে ফেলতে পারেন, কিন্তু যে প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই, তা কী করে দেব?

—প্রায়ই কি উনি এরকম সময়ে বাইরে যান?

—হ্যাঁ।

—কখন ফেরেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—রাত ফুরোবার ঠিক আগে।

ক্যাপ্টেন বাউমগার্টেন যুগপৎ হতাশ ও বিরক্ত হলেন। লোকটা বোধহয় ঠিকই বলছে—লর্ড হয়তো সত্যিই বাড়িতে নেই। কিছু লোককে প্রাসাদের সামনে আর কয়েকজনকে পিছনে পাহারা দিতে বলে তিনি আর সার্জেন্ট কাজের লোকটিকে সামনে রেখে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লেন। বাড়িটা সার্চ করা দরকার। ভয়ে কাঁপছিল লোকটি। তার হাতে ধরা মোমবাতির কাঁপা-কাঁপা আলোয় বাড়ি সার্চ করা হল। একতলার বিশাল রান্নাঘর থেকে শুরু করে দোতলার বিশাল খাওয়ার ঘর পর্যন্ত পুরো প্রাসাদ সার্চ করেও কোথাও কোনও জীবনের লক্ষণ পাওয়া গেল না। একদম ওপরে চিলেকোঠায় ছিল মেরি—কাজের লোকটির স্ত্রী। বাড়িতে আর কোনও চাকর-বাকর নেই এবং মালিকের কোনও চিহ্ন নেই।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সার্চের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারলেন ক্যাপ্টেন বাউমগার্টেন।

বাড়িটা সার্চ করা সত্যিই কঠিন। সরু-সরু সিঁড়ি, যাতে একজনই যেতে পারে। বাড়ির চতুর্দিকে গোলোকধাঁধার মতো অজস্র অলিন্দ। দেওয়ালগুলো এত চওড়া যে পাশাপাশি ঘরগুলোও কার্যত সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন। বিশাল সাইজের ফায়ার প্লেস। জানলাগুলো দেওয়ালের মধ্যে প্রায় ছ'ফুট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢোকানো। বহু চেষ্টা করেও কিন্তু ক্যাপ্টেন কোথাও কোনও গুপ্ত লুকোনোর জায়গা খুঁজে পেলেন না।

অবশেষে তিনি সার্জেন্টকে বললেন,—আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। এই কাজের লোকটার সঙ্গে আমাদের একজন গার্ডকে রেখে দাও। লক্ষ রেখো, ও যেন কারোর সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ না করে। বাইরে যারা পাহারা দিচ্ছে তাদের বলে দাও অতর্কিতে আক্রমণ করার জন্য তৈরি থাকতে। মনে হয়, ভোরের আগেই পাখি বাসায় ফিরবে।

—ঠিক আছে। আমাদের বাকি লোকরা কী করবে?

—ওদের সবাইকে রান্নাঘরে গিয়ে খেয়ে নিতে বলো। আর তুমিও কিছু খেয়ে নাও। ঝড়বৃষ্টির রাত, বাইরে থাকার বদলে বাড়িতে বসে পাহারা দেওয়াই ঠিক হবে। আমি এই খাওয়ার ঘরেই বসছি। কোনওরকম বিপদের আঁচ পেলেই আমায় ডাকবে।

ক্যাপ্টেন পোড়-খাওয়া সৈনিক। শত্রু পরিবেষ্টিত অনেক পরিবেশেই আগে রাত কাটিয়েছেন। কাজের লোকটিকে খাবার ও পানীয় আনতে বলে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালিয়ে তিনি আরামে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে ফেললেন। বাতিদানের দশটা মোমবাতিই জ্বালালেন। ফায়ারপ্লেস থেকে কাঠ জ্বলার গন্ধ আর নীল ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। জানলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে গিয়ে দেখলেন, চাঁদ আবার মেঘের আড়ালে চলে গেছে। ঝেপে বৃষ্টি এসেছে। হাওয়ায় শোঁশোঁ শব্দ।

এরই মধ্যে খাবার ও পানীয় এসে গেল। সারাদিনের ধকলের পর ক্যাপ্টেন ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। সুতরাং তলোয়ার, হেলমেট ও বেল্টসুদ্ধু রিভলভার খুলে একটা চেয়ারের ওপর রেখে তিনি খাওয়া সেরে নিলেন। তারপর পানীয়ের গেলাসটা সামনে রেখে একটা চুরুট ধরিয়ে চেয়ারটা পিছনদিকে হেলিয়ে আরাম করে বসলেন।

মোমবাতির আলোর বৃত্তের বাইরে এই বিশাল খাওয়ার ঘরের অন্যান্য অংশ আলোছায়ায় কেমন রহস্যময় লাগছিল। দুটো দেয়ালে কালো কাঠের প্যানেল আর দুটো দিকে পরদা ঝোলানো—তাতে শিকারের ছবি। ফায়ার প্লেসের ওপর বেশ ক'টা পারিবারিক শিল্ড রাখা—প্রতিটির ওপর ক্রশ চিহ্ন।

আগের প্রজন্মের চারজন কাউন্টের বিশাল অয়েল পেন্টিং ঝুলছে ফায়ারপ্লেসের উলটোদিকের দেওয়ালে। প্রত্যেকেরই নাক বাজপাখির ঠোঁটের মতো আর মুখমণ্ডলে এক ধরনের উগ্রতা। চারজনকে প্রায় একইরকম দেখতে। পোশাকের তফাত ছাড়া তাদের আলাদাভাবে চেনা কঠিন। এই চারজনের ছবি দেখতে-দেখতে ঘরের আরামদায়ক উষ্ণতায় ঘুমে চোখ বুজে এল ক্যাপ্টেনের। একটু পরেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর মাথাটা ঝুলে পড়ল বুকের ওপর।

হঠাৎ একটা ছোট্ট আওয়াজ শুনে ক্যাপ্টেন তড়াক করে উঠে পড়লেন। ঘুমের চোখে তাঁর প্রথমে মনে হল পেন্টিং-এর একটি চরিত্র যেন ফ্রেম থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছে। তারপরেই ক্যাপ্টেন বুঝলেন তাঁর একহাত দূরে টেবিলের পাশে বিশাল চেহারার এক রক্তমাংসের মানুষ দাঁড়িয়ে। স্থির, জ্বলজ্বলে দুটি চোখ ছাড়া প্রায় মৃতের মতো স্তব্ধ।

মানুষটির চুল কালো, গায়ের রং জলপাইয়ের মতো। থুতনিতে ছুঁচলো কালো দাড়ি। নাকটা বাজপাখির ঠোঁটের মতো। গালের চামড়া কিছুটা কুঁচকে গেছে, কিন্তু চওড়া কাঁধ আর কবজির হাড় দেখে বোঝা যায় যে বয়স তাঁর অপরিসীম শারীরিক শক্তিকে গ্রাস করতে পারেনি। হাত দুটো বুকের ওপর জড়ো করা আর মুখে শীতল হাসি।

—না, না, আপনার অস্ত্রশস্ত্রগুলো খোঁজার জন্য কষ্ট করবেন না। ক্যাপ্টেন খালি চেয়ারের দিকে আড়চোখে তাকাতেই মানুষটি বলে উঠলেন,—আপনি বোধহয় একটু অবিবেচক। যে বাড়ির ভেতরটা এমন গোলোকধাঁধার মতো, আর যেখানে এত গোপন যাতায়াতের জায়গা আছে, সেখানে আপনি এত নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলেন! কেমন মজা দেখুন তো—আপনি যখন খাওয়াদাওয়া করছিলেন, তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার চল্লিশজন লোক আপনার ওপর নজর রাখছিল।...এ কী, এটা আবার কী করছেন?

ক্যাপ্টেন দু-হাতে ঘুষি পাকিয়ে এগোতেই, আগন্তুক ডান হাতে রিভলভার ধরে বাঁ-হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে ক্যাপ্টেনকে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

—চুপ করে বসে থাকুন। আপনার লোকজনের ব্যাপারে ভাবতে হবে না। ওদের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এখন আর আপনার অধীনস্থ কোনও দল এখানে নেই। সুতরাং এখন খালি নিজের কথাই ভাবুন।...কী নাম আপনার?

—আমি ২৪ নম্বর পোসেন রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন বাউমগার্টেন।

—বেশ ভালোই ফরাসি বলেন দেখছি, অবশ্য একটু জার্মানসুলভ টান আছে উচ্চারণে। আশা করি জানেন আমি কে।

—আপনি এই প্রাসাদের মালিক কাউন্ট ইউস্তাস।

—ঠিক ধরেছেন। আমার বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা বা একটু কথাবার্তা না হলে খুব দুভার্গ্যের ব্যাপার হত। এর আগে বহু জার্মান সৈনিকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, কিন্তু এই প্রথম একজন জার্মান অফিসারের মুখোমুখি হলাম। আপনাকে অনেক কিছু বলার আছে।

ক্যাপ্টেন চেয়ারে চুপ করে বসে রইলেন। কাউন্টের কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যে ক্যাপ্টেন তাঁর শিরদাঁড়ায় একটা অজানা আশংকার শিরশিরানি টের পেলেন। তাঁর অস্ত্রশস্ত্র আশেপাশে কোথাও দেখতে পেলেন না। তাছাড়া কাউন্টের বিশাল আকৃতি ও শক্তির কাছে তিনি যে শিশু, সেটা একটু আগেই ক্যাপ্টেন বুঝতে পেরেছেন। কাউন্ট হঠাৎ মদের বোতলটা আলোর দিকে তুলে বলে উঠলেন,—ছি! ছি! পিয়ের আপনাকে এই অতিসাধারণ ওয়াইনটা দিয়েছে। কী লজ্জার কথা বলুন তো! না, না, আরও ভালো কিছু আনানো যাক।

কাউন্টের জ্যাকেটের গলার কাছে ঝোলানো একটা হুইস্‌ল—সেটা তিনি বাজালেন। সেই কাজের লোকটি তৎক্ষণাৎ ঘরে এসে হাজির হল।

—১৫ নম্বর বিন থেকে পুরোনো একটা ভালো ওয়াইন নিয়ে এসো।

কাউন্ট আদেশ দেওয়ার খানিক পরেই পিয়ের অতি সন্তর্পণে একটা বোতল নিয়ে এল। কাউন্ট তার থেকে দুটো গ্লাস ভরলেন।

—নিন, খান! আমার সংগ্রহের সব থেকে ভালো ওয়াইনের মধ্যে এটি একটি। খান, আনন্দ করে খান। মাংস, গলদা চিংড়ি—এসবও আছে। কিছু আনাব নাকি? আর একবার একটু ভালো করে ডিনার করুন। বললেন কাউন্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালেন। তবে ওয়াইনের গ্লাসটা শেষ করলেন। গ্লাসটা আবার ভরে দিয়ে কাউন্ট বললেন,—আমার বাড়ির সবকিছুই আপনার জন্য। আপনি চাইলেই হল! যাই হোক, আপনি ওয়াইনটা খেতে থাকুন আর আপনাকে আমি একটা গল্প বলি। গল্পটি কোনও জার্মান অফিসারকে বলার জন্য আমি বড় উৎসুক ছিলাম। আমার একমাত্র সন্তানকে নিয়ে এইগল্প। ও যুদ্ধবন্দি হয়ে পালাতে গিয়ে মারা যায়। গল্পটি বিচিত্র এবং আপনাকে আমি হলফ করে বলতে পারি, এ-গল্প আপনি জীবনে ভুলতে পারবেন না।

—আমার ছেলেটা বড় ভালো ছিল ক্যাপ্টেন। গোলন্দাজ-বাহিনীতে অফিসার, ওর মায়ের গর্ব। ওর মৃত্যুর খবর আসার এক সপ্তাহের মধ্যে ওর মা মারা যান। মৃত্যুর খবরটা এনেছিল ওর এক সহকর্মী, যে বেঁচে পালাতে পেরেছিল। ও যা বলেছিল সেটাই আপনাকে বলতে চাই।

—৪ঠা আগস্ট আমার ছেলে উইসেনবুর্গে ধরা পড়ে। যুদ্ধবন্দিদের কয়েকটা দলে ভাগ করে জার্মানরা তাদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠায়। আমার ছেলেকে পাঁচ তারিখে যে গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানকার জার্মান অফিসার ওদের সঙ্গে ভদ্র ও সদয় ব্যবহার করেন। ওই জার্মান অফিসার আমার ক্ষুধার্ত সন্তানকে খাবার দেন, সঙ্গে এক বোতল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো ওয়াইনও দেন—যেমন আমি আপনাকে দিলাম। উনি আমার ছেলেকে নিজের বাক্স থেকে একটা চুরুট-ও দেন।...নেবেন নাকি একটা চুরুট?

ক্যাপ্টেন মাথা ঝাঁকিয়ে 'না' বললেন। কাউন্টের মুখের শীতল হাসি আর জ্বলজ্বলে চোখ দেখে তাঁর ভয় করছিল।

—ওই জার্মান অফিসার আমার ছেলের সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু পরের দিন ওদের একটা অন্য গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। জানেন ক্যাপ্টেন, দুর্ভাগ্যবশত এই নতুন জায়গার জার্মান অফিসারটি ছিল গুন্ডা প্রকৃতির ও অত্যন্ত বদ। সে যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করত আর কারণে-অকারণে তাদের অপমান করত। একদিন রাতে তার অপমানের বিরুদ্ধে আমার ছেলে উচিত জবাব দিতেই ওই বদমাইশ জার্মান অফিসার তার চোখের ওপর ঘুসি মারে—ঠিক এইরকম করে!

ঘুষির আওয়াজে সারা ঘরটা যেন ঝনঝন করে উঠল। ক্যাপ্টেন বাউমগার্টেনের মাথাটা ঝুলে পড়ল বুকের ওপর আর তিনি মুখে হাত চাপা দিতেই হাতের ফাঁক দিয়ে রক্তের ধারা বেরিয়ে এল। কাউন্ট আবার ধীরেসুস্থে তাঁর চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

—ওই ঘুষিতে আমার ছেলের মুখটা বিকৃত হয়ে যায় আর সেই পাষণ্ড জার্মান তাই নিয়ে আমার ছেলেকে ব্যঙ্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

-বিদ্রুপ করত।...ক্যাপ্টেন, আপনাকেও এখন দেখতে বেশ হাস্যকর লাগছে। আপনাকে এখন দেখলে আপনার কর্নেল নিশ্চয় ভাববেন যে কোথাও দুষ্টুমি করতে গিয়ে আপনি মার খেয়ে এসেছেন। যাই হোক, গল্পেতে আবার ফেরা যাক। আমার ছেলে তখন কপর্দকশূন্য। তাই দেখে একজন দয়ালু জার্মান মেজর ওকে দশটি স্বর্ণমুদ্রা কোনওরকম কিছু বন্ধক ছাড়াই ধার দেন। আমি সেই মেজরকে চিনি না, তাই এই দশটি স্বর্ণমুদ্রা, ক্যাপ্টেন, আপনার মাধ্যমে আমি ফেরত দিলাম—এগুলি গ্রহণ করুন। সেই দয়ালু জার্মান মেজরের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

—ওই গুন্ডা প্রকৃতির অফিসারটি ইতোমধ্যে যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে একটার-পর-একটা নতুন জায়গায় যাচ্ছিল। আমাদের বংশের কেউ কখনও কোনও অপরাধ মাথা নুয়ে সহ্য করে না। তাই আমার ছেলের ওপর সেই পাষণ্ডের অত্যাচার চলতেই থাকল। সে আমার ছেলেকে কখনও হাত দিয়ে মারত, কখনও লাথি মারত, আবার কখনও বা তার গোঁফের চুল টেনে ছিঁড়ত—ঠিক এইভাবে, এইভাবে, এইভাবে।

ক্যাপ্টেন বাউমগার্টেন যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। কিন্তু বিশালকায় এই মানুষটির ক্রমান্বয় আঘাতের সামনে তিনি অসহায়। শেষে অর্ধচেতন ও প্রায় অন্ধ অবস্থায় তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন কোনওক্রমে উঠে দাঁড়ালেন, কাউন্ট আবার ধাক্কা মেরে তাঁকে সেই চেয়ারেই বসিয়ে দিলেন। নিষ্ফল রাগে, অপমানে ক্যাপ্টেন ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললেন।

—আমার ছেলেটাও অপমানে এইরকমই আপনার মতো কেঁদে ফেলত। বললেন কাউন্ট,—ভেবে দেখুন, উদ্ধত ও নির্দয় শত্রুর বিরুদ্ধে কিছু না করতে পারার অসহায়তা কী নিদারুণ! আমার ছেলের মুখের বিকৃত, রক্তাক্ত অবস্থা দেখে একজন জার্মান সেপাই ওর মুখে ব্যান্ডেজ করে দেয়। আপনারও দেখছি চোখের থেকে রক্তপাত হয়েছে। আমার এই সিল্কের রুমালটা দিয়ে আপনার ক্ষতস্থানটা কি বেঁধে দেব?

কাউন্ট ঝুঁকতেই, ক্যাপ্টেন এক ঝটকায় তাঁর হাতটা সরিয়ে দিলেন।

—তোমার মতো পাষণ্ডের অত্যাচার সহ্য করতে পারি, কিন্তু অসহ্য তোমার এই ভণ্ডামি। বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে কাউন্ট বললেন—ঘটনাগুলি আমি খালি ক্রমানুসারে বলে যাচ্ছি। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, প্রথম যে জার্মান অফিসারের সঙ্গে আমার দেখা হবে, তাকে সবকিছু বলব। কত অবধি যেন বলেছি—হ্যাঁ, সেই দয়ালু জার্মান সেপাইয়ের কথা পর্যন্ত। খুবই খারাপ লাগছে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি আমার হাতের থেকে প্রাথমিক চিকিৎসাটুকুও করাতে চাইছেন না! যাই হোক, আমার ছেলেকে এর পর পনেরো দিন বন্দি করে রাখা হয়। সবথেকে খারাপ লাগত যখন ও কুঠুরির জানলার কাছে সন্ধের সময় চুপচাপ বসে থাকত আর জার্মান সেপাইরা ওকে নিয়ে ব্যঙ্গ করত, যেন ও একটা রাস্তার কুকুর। আপনিও আপাতত যেভাবে বসে আছেন তা নিয়ে ব্যঙ্গ করা যায়, তাই না?—চুপ করে বোস ওই চেয়ারে, কুকুর কোথাকার!

—হ্যাঁ, দিন পনেরো বন্দি থাকার পর আমার ছেলে আর ওর বন্ধু পালাল। কত বিপদের সামনে যে ওরা পড়েছিল, কত কষ্ট করতে হয়েছিল ওদের—সেসব এখন বলে লাভ নেই। ওরা কৃষকের ছদ্মবেশে রাতের পর রাত হেঁটে জার্মানদের অধিকৃত জায়গার শেষপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। মুক্তি যখন মাত্র আর একমাইল দূরে, তখন জার্মানদের এক টহলদারী সেনাদলের হাতে ওরা ধরা পড়ে গেল। তীরে এসে তরী ডোবা একেই বলে, তাই না?

কাউন্ট এবার হুইস্‌লটা দু-বার বাজালেন। তিনজন রুক্ষদর্শন চাষা-ভূষো গোছের লোক ঘরের মধ্যে চলে এল।

—মনে করুন, এই তিনজন আমার টহলদারী সেনা। বললেন কাউন্ট,—যে জার্মান ক্যাপ্টেনের কাছে আমার ছেলে ও তার বন্ধুকে নিয়ে যাওয়া হল, তিনি বিনা বিচারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের ফাঁসির হুকুম দিলেন। ওদের অপরাধ? ওরা ফরাসি সৈনিক হওয়া সত্ত্বেও বেসামরিক পোশাকে জার্মানি অধিকৃত জায়গায় ধরা পড়েছে।—যা, ওই মাঝখানের কড়িকাঠটা ব্যবহার কর, ওটা বেশ পোক্ত আছে।

তারপর ক্যাপ্টেনকে তাঁর চেয়ার থেকে উঠিয়ে টানতে-টানতে ঘরের মাঝখানে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর মাথার ঠিক ওপরেই ফাঁস দেওয়া একটা মোটা দড়ি ঝোলানো। ফাঁসটা ক্যাপ্টেনের মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে দেওয়া হল। তিনি গলায় দড়ির কর্কশভাব অনুভব করতে পারছিলেন। সেই তিনজন লোক দড়ির এক প্রান্ত ধরে কাউন্টের আদেশের অপেক্ষায় রইল।

ক্যাপ্টেন বাউমগার্টেনের মুখ বিবর্ণ, কিন্তু তবুও তিনি শক্ত থাকার চেষ্টা করছিলেন। হাত দুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে নির্ভীকভাবে কাউন্টের দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন।

—আপনি এখন মৃত্যুর মুখোমুখি। আপনার ঠোঁট দেখেই বুঝতে পারছি যে আপনি প্রার্থনা করছেন। আমার ছেলেও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেছিল। সেইসময় হঠাৎ এক পদস্থ জার্মান অফিসার এসে পড়েন। তিনি শুনতে পান যে আমার ছেলে ওর মায়ের জন্য প্রার্থনা করছে। অফিসার নিজেও সন্তানের পিতা। তিনি আর সবাইকে বাইরে যেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে দুই বন্দির কাছে গেলেন। আমার ছেলে ওঁকে সবকিছু খুলে বলল। এও জানাল যে, সে তার বৃদ্ধ পিতামাতার একমাত্র সন্তান ও তার মা অসুস্থ।

স্নেহপ্রবণ মহান সেই জার্মান অফিসার তখনই ওর গলা থেকে ফাঁসির দড়িটা খুলে দিলেন—যেমন আপনার দড়িটাও আমি খুলে দিলাম। তারপর উনি আমার ছেলের দুই গালে পরম স্নেহভরে চুম্বন করলেন—আমিও, ক্যাপ্টেন, তোমাকে সেইভাবে চুম্বন করলাম। শেষে উনি আমার ছেলেকে চলে যেতে বললেন—যেমন আমিও তোমাকে এখন চলে যেতে বলছি। আমার ছেলে ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে মারা যায়। কিন্তু ক্যাপ্টেন, সেই মহান জার্মান অফিসারের সমস্ত আশীর্বাদ যেন তোমায় রক্ষা করে।

তারপরেই ক্যাপ্টেন বাউমগার্টেন আহত, রক্তাক্ত অবস্থায়, ক্ষতচিহ্ন আঁকা মুখ নিয়ে টলতে-টলতে কালো প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এলেন—ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টিতে ভরা সেই দুরন্ত শীতের ভোরে।

'The Lord of Chateau Noir' গল্পের অনুবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

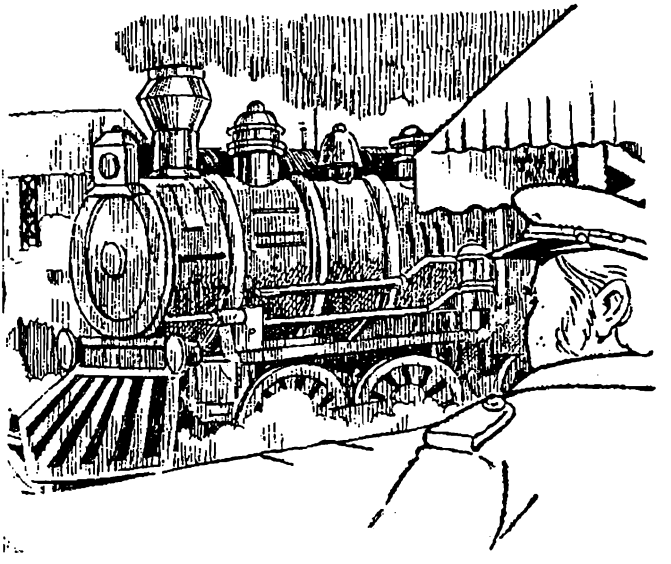

নিরুদ্দেশ ট্রেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্রান্সের মার্সাই শহরের জেল থেকে ফাঁসির আসামি হারবাট দ্য লেরনক-এর সম্প্রতি একটি স্বীকারোক্তি পাওয়া গেছে। আট বছর আগের এক চাঞ্চল্যকর ও আগাগোড়া রহস্য মোড়া অপরাধের একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা এই স্বীকারোক্তি থেকে দাঁড় করানো যায়। পুলিশ ও প্রশাসন এই অপরাধের সমাধান করতে না পারায় ব্যাপারটা প্রায় ধামাচাপাই ছিল এতদিন।

আগে বলি, ঘটনাটি কী। মোটামুটি তিনটি সূত্রের ভিত্তিতে ঘটনাটির একটা বিবরণ তৈরি করা যায়— লিভারপুল শহরের ওই সময়ের খবরের কাগজ, রেল কোম্পানির নথিপত্র এবং ইঞ্জিন ড্রাইভার জন স্লেটার-এর মৃত্যুতদন্ত সম্পর্কিত পুলিশ-আদালতের কাগজপত্র।

তারিখ ঃ ৩রা জুন, ১৮৯০। স্থান ঃ লিভারপুলের ওয়েস্ট কোস্ট সেন্ট্রাল স্টেশন। মঁসিয়ে লুই কারাতাল নামের এক ব্যক্তি স্টেশনমাস্টার জেমস ব্ল্যান্ডের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

কারাতাল লোকটি মাঝবয়সি ও ছোটখাটো চেহারার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর গায়ের রং একটু চাপা। একটু ঝুঁকে চলেন। তাঁর একটি সঙ্গী ছিল, তার আকৃতি বিশাল। কিন্তু সেই সঙ্গীটির বশংবদ হাবভাবে বোঝা যাচ্ছিল সে কারাতালের আজ্ঞাধীন। সঙ্গীর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল সে স্পেন বা দক্ষিণ আমেরিকার লোক। তার কবজির সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটা চামড়ার ব্রিফকেস অনেকের নজরে পড়েছিল।

কারাতাল স্টেশনমাস্টারের অফিসে ঢুকলেন আর তাঁর সঙ্গী বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। কারাতাল স্টেশনমাস্টার মিঃ ব্ল্যান্ডকে জানালেন যে তিনি আজ দুপুরেই আমেরিকা থেকে এসেছেন লিভারপুলে। আজই আবার বিশেষ দরকারে তাঁকে প্যারিসে যেতে হবে। প্যারিস যেতে গেলে আগে লিভারপুল থেকে লন্ডনে পৌঁছতে হবে। কিন্তু লন্ডন এক্সপ্রেস ইতিমধ্যেই লিভারপুল থেকে রওনা হয়ে গেছে। তাই তাঁর একটা স্পেশাল ট্রেন দরকার, খরচা যতই হোক না কেন।

মিঃ ব্ল্যান্ড পাঁচ মিনিটের মধ্যেই স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করে দিলেন। তবে ট্রেনটি ছাড়বে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে। লাইন ক্লিয়ার করার জন্য এই সময়টুকু লাগবে। একটা বেশ শক্তিশালী ইঞ্জিন, দুটো বগি আর গার্ডের কামরা—এই হল ট্রেন। প্রথম বগিটি খালিই থাকবে—ঝাঁকুনি কম করার জন্য এই বগিটি দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বগিতে আছে চারটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামরা। এর মধ্যে ইঞ্জিনের দিকে প্রথম কামরাটিতে থাকবেন যাত্রী দুজন। বাকি তিনটি কামরা খালি থাকবে। ইঞ্জিন ড্রাইভার জন স্লেটার। গার্ড জেমস ম্যাকফারসন—রেল কোম্পানির পুরোনো কর্মচারী। ইঞ্জিনে কয়লা দেওয়ার লোকটি অবশ্য নতুন চাকুরে, নাম উইলিয়ম স্মিথ।

কথাবার্তা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে রেল কোম্পানির টাকাকড়ি মিটিয়ে দিলেন মঁসিয়ে কারাতাল। যদিও ট্রেন ছাড়তে তখনও আধঘণ্টার বেশি দেরি আছে, কারাতাল ও তাঁর সঙ্গী ট্রেনে বসার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়লেন। অগত্যা তাঁদের ট্রেনে বসিয়ে দেওয়া হল।

ইতিমধ্যে স্টেশন মাস্টারের অফিসে একটা ঘটনা ঘটল।

তখনকার দিনে বড় শহরে স্পেশাল ট্রেনের চাহিদা থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু মঁসিয়ে কারাতাল মিঃ ব্ল্যান্ডের অফিস থেকে বেরনোর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মিঃ হোরেস মূর নামের এক ভদ্রলোক স্টেশন মাস্টারকে জানালেন যে, লন্ডনে অসুস্থ স্ত্রীর কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছনোর জন্য তাঁরও একটি স্পেশাল ট্রেন চাই। কিন্তু মিঃ ব্ল্যান্ডের কাছে অতিরিক্ত ট্রেন না থাকায় তিনি মিঃ মূরকে বললেন মঁসিয়ে কারাতালের ট্রেনে যেতে। তাতে দুজনেরই খরচা কম হবে। খালি কামরা তো আছেই।

এই প্রস্তাব সময়োপযোগী ও কম খরচাসাপেক্ষ হওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্ত্বেও মঁসিয়ে কারাতাল কিন্তু প্রস্তাবটি সরাসরি নাকচ করে দিলেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে অন্য কারোর সঙ্গে ট্রেন ভাগাভাগি করার ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র উৎসাহী নন। কারাতালের এই ব্যবহারে ব্যথিত হয়ে মিঃ মূর অগত্যা সন্ধে ছ'টার প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যাওয়াই ঠিক করলেন।

ঠিক সাড়ে চারটের সময় কারাতাল ও তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে স্পেশাল ট্রেন লিভারপুল স্টেশন ছাড়ল। আগে লাইন ক্লিয়ার করাই আছে, সুতরাং ট্রেন সোজা গিয়ে সন্ধে ছ'টা নাগাদ প্রথমে থামবে ম্যানচেস্টার স্টেশনে। কিন্তু সওয়া ছ'টার সময় ম্যানচেস্টার স্টেশন থেকে লিভারপুলে টেলিগ্রাফ এল ঃ স্পেশাল ট্রেন এখনও ওখানে পৌঁছোয়নি। অথচ খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, ট্রেনটি চারটে বাহান্নয়, ঠিক সময়ে সেন্ট হেলেন্‌স স্টেশন পেরিয়ে গেছল। সন্ধে সাতটায় আবার ম্যানচেস্টার থেকে টেলিগ্রাফ এল ঃ পরের ট্রেন ম্যানচেস্টার পৌঁছে গেছে এবং সেই স্পেশাল ট্রেনটির দ্যাখা পাওয়া যায়নি।

এই বিচিত্র ও অভাবনীয় ঘটনায় রেল কর্তৃপক্ষ অবাক হয়ে গেলেন। ট্রেনটি কোনও দুর্ঘটনায় পড়েনি তো? কিন্তু সে ক্ষেত্রে পরের ট্রেনটি তা দেখতে পেত। ছোটখাটো কোনও সারাইয়ের জন্য ড্রাইভার কি ট্রেনটিকে কোনও সাইড লাইনে নিয়ে গেল? পরিস্থিতি বোঝার জন্য তখন সেন্ট হেলেনস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং ম্যানচেস্টার স্টেশনের মধ্যের সব স্টেশনে টেলিগ্রাফ পাঠানো হল। উত্তরগুলো এল এইরকম ঃ

স্টেশনের নাম	স্পেশাল ট্রেন কখন গেছে
কলিন্‌স গ্রিন	৫.০০
আর্লসটাউন	৫.০৫
নিউটন	৫.১০
কেনিয়ন জংশন	৫.২০
বার্টন মস	ট্রেন এখানে আসেনি।

—আমার তিরিশ বছরের চাকরিতে এরকম কাণ্ড দেখিনি। বললেন হতভম্ব মিঃ ব্ল্যান্ড।

—কেনিয়ন জংশন ও বার্টন মস স্টেশনের মাঝখানে নিশ্চয়ই কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। বললেন ট্র্যাফিক ম্যানেজার মিঃ হুড।

—আমার যতদূর মনে পড়ে, ওই অঞ্চলে কোনও সাইডিং নেই। তাহলে কি ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়েছে?

—তাহলে সেটা পরের ট্রেনের নজরে অবশ্যই পড়ত।

—যাই হোক, ম্যানচেস্টার ও কেনিয়ন জংশনে আরও খবরের জন্য টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে দিন। আর ওদের বলে দিন কেনিয়ন জংশন ও বার্টন মস-এর মধ্যে লাইনটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে।

ম্যানচেস্টার থেকে উত্তর এল ঃ ট্রেনের এখনও কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবর নেই। কোনও দুর্ঘটনা হয়নি। লাইন পরিষ্কার ও স্বাভাবিক।

কেনিয়ন জংশনের উত্তর ঃ ট্রেনের কোনও চিহ্ন নেই। পুরো লাইন পরীক্ষা করা হয়েছে। কোনও দুর্ঘটনা হয়নি। লাইন পরিষ্কার। ট্রেন এখানে ঠিক সময়ে পৌঁছেছিল, তারপরে কী হয়েছে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

উত্তেজিত মিঃ ব্ল্যান্ড বললেন,—আমরা কি উন্মাদ হয়ে গেলাম? ফটফটে দিনের আলোয় একটা ট্রেন হাওয়ায় মিশে গেল? ইঞ্জিন, দুটো বগি, গার্ডের কামরা, পাঁচটা মানুষ—সব অদৃশ্য হয়ে গেল? একঘণ্টার মধ্যে কোনও খবর না পেলে আমি নিজে ইনস্পেকটর কলিন্‌স-কে নিয়ে তদন্ত করতে যাব।

এর খানিকক্ষণ পরে আর-একটা টেলিগ্রাফ এল কেনিয়ন জংশন থেকে ঃ রেললাইনের পাশে নীচে ঝোপের মধ্যে ইঞ্জিন ড্রাইভার জন স্লেটারের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। জায়গাটা স্টেশন থেকে সওয়া দু-মাইল দূরে। যতদূর মনে হয় ইঞ্জিন থেকে পড়ে নীচে গড়িয়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়ে মারা গেছে। কিন্তু আশেপাশে কোথাও ট্রেনটির কোনও চিহ্ন নেই।

সেই সময় ফ্রান্সের কিছু রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে ইংল্যান্ডের খবরের কাগজগুলিতে এত লেখালেখি হচ্ছিল যে ট্রেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি সেরকম কোনও গুরুত্ব পেল না। কিছু কাগজের অভিমত, পুরো ঘটনাটি একটা নতুন ধরনের ধাপ্পা। অবশ্য শেষে জন স্লেটারের মৃত্যু সংবাদে লোকে ঘটনাটির সত্যতা সম্বন্ধে খানিকটা নিশ্চিন্ত হল।

যাই হোক, ঘটনার দিন সন্ধেবেলায় মিঃ ব্ল্যান্ড ইনস্পেকটর কলিনস্‌কে নিয়ে কেনিয়ন জংশনে তদন্তে গেলেন। পরের দিন যখন তাঁদের তদন্ত শেষ হল, তখনও ট্রেনের তো কোনও হদিস পাওয়াই গেল না, ঘটনার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাও মিলল না। তবে ইনস্পেকটর কলিন্‌স-এর রিপোর্ট থেকে কিছু সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পুলিশ রেকর্ড থেকে সংগ্রহ করা সেই রিপোর্টের সারমর্ম এইরকম ঃ

এই দুটো স্টেশনের মাঝখানে অনেকগুলো লোহার কারখানা ও কোলিয়ারি আছে—কিছু চালু, কিছু বন্ধ হয়ে গেছে। এই কারখানা ও কোলিয়ারিগুলোর মালপত্র ট্রলিতে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য কমপক্ষে বারোটা ন্যারোগেজ লাইন আছে যেগুলো মেন লাইনের সঙ্গে যুক্ত। যেহেতু স্পেশাল ট্রেনটি ব্রডগেজের, এই ছোট লাইনগুলোকে তদন্তের আওতা থেকে বাদ দেওয়া যায়। কিন্তু এগুলো ছাড়াও সাতটা বড় লাইন আছে, যেগুলো মেন লাইনের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। এর মধ্যে চারটে লাইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোলিয়ারিগুলো আপাতত পরিত্যক্ত। বাকি তিনটে লাইনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে প্রথমটা মাত্র সিকি মাইল লম্বা এবং এর আশেপাশে স্পেশাল ট্রেনটির দেখা যায়নি। দ্বিতীয় লাইনটি সিঙ্গল লাইন এবং ঘটনার দিন (৩রা জুন) ষোলোটা মালভরতি বগি পুরো লাইনটাকে আটকে রেখেছিল। তৃতীয় লাইনটি ডবল লাইন এবং এই লাইনে সারাদিন ধরে প্রচুর খনিজ পদার্থ নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ৩রা জুন কয়েকশো লোক—খনিশ্রমিক ও রেলওয়ে কর্মী—এই সওয়া দু-মাইল লম্বা রেলপথের আশেপাশে কাজ করছিল এবং স্পেশাল ট্রেনটি এই লাইনে এলে সেটি অবশ্যই তাদের নজরে পড়ত। তা ছাড়া ইঞ্জিন ড্রাইভারের লাশ এই লাইনের কাছাকাছি পাওয়া যায়নি। সুতরাং, এই অঞ্চলটা পেরোনোর পরেই ট্রেনটি নিখোঁজ হয়।

আর ইঞ্জিন ড্রাইভার জন স্লেটারের সম্বন্ধে এইটুকুই বলতে পারি যে, ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েই তার মৃত্যু হয়, যদিও কেন বা কীভাবে সে পড়ে গেল কিংবা তারপর ইঞ্জিনটার কী হল, এ সম্বন্ধে কোনও সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না।

এরপর পুলিশের অপদার্থতা নিয়ে কাগজে লেখালেখি হতে ইনস্পেকটর কলিন্‌স এই তদন্তের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন।

পুলিশ ও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এরপর মাসখানেক চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেও এই রহস্যের কোনও সমাধান করতে পারলেন না। পুরস্কার ঘোষণা, অপরাধীকে ক্ষমা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি পদক্ষেপও ব্যর্থ হল।

ইংল্যান্ডের এক জনবহুল অঞ্চলে প্রকাশ্য দিবালোকে যাত্রীসমেত একটা ট্রেন ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার এই ঘটনাকে কেউ বললেন আধিদৈবিক, কেউ বা বললেন আধিভৌতিক। কারাতাল বা তাঁর সঙ্গী হয়তো রক্তমাংসের মানুষই নন।

খবরের কাগজে চিঠিপত্র কলমে কয়েকজন পাঠক সমাধানের কিছু সূত্র পাঠিয়েছিলেন। এর মধ্যে একজন ছিলেন তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত। তিনি লিখলেন ঃ একটি-একটি করে সমস্ত সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে এবং একে-একে সেগুলি বাদ দিয়ে শেষে যে সম্ভাবনাটি পড়ে থাকবে, তা যতই অসম্ভব লাগুক না কেন, সেটিই সত্যি। কলিয়ারির ওই তিনটে রেল লাইনে তদন্ত চালানো হোক। নিশ্চয়ই ওখানে খনিশ্রমিকদের কোনও গুপ্ত সংগঠন আছে। তারাই যাত্রীসমেত ট্রেনটিকে হাপিস করে দিয়েছে। ওই খনিশ্রমিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার।

আর-একজন লিখলেন যে, ট্রেনটি নিশ্চয়ই লাইনচ্যুত হয়ে রেললাইনের পাশের খালে পড়ে গেছে। এই যুক্তি অবশ্য সরাসরি নাকচ হয়ে গেল কেন না ট্রেনটি সম্পূর্ণভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডুবে যাওয়ার মতো গভীর কোনও খাল আশেপাশে নেই।

অন্য একজনের মতে, কারাতালের সঙ্গীর ব্রিফকেসে এমন শক্তিশালী ও অভিনব বিস্ফোরক পদার্থ ছিল যে, পুরো ট্রেনটিই বিস্ফোরণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই যুক্তিও ধোপে টিকল না, কেন না সেই বিস্ফোরণ সত্ত্বেও রেললাইন তাহলে কী করে অক্ষত রইল।

যাই হোক, সবাই যখন এই রহস্য সমাধানের আশা ছেড়ে দিয়েছে, তখন একটা নতুন ঘটনা ঘটল।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। একটা চিঠি। যেটা সেই নিরুদ্দেশ ট্রেনের গার্ড ম্যাকফারসন ৫ জুলাইতে তাঁর স্ত্রীকে লিখেছিলেন। চিঠিটা নিউইয়র্ক থেকে পোস্ট করা এবং তাঁর স্ত্রী সেটা পান ১৪ জুলাই। চিঠির সঙ্গে ছিল একশো ডলার। চিঠিটা এইরকম ঃ

'তোমাকে আর তোমার বোন লিজিকে ছেড়ে এসে আমার কষ্ট হচ্ছে। যা টাকা পাঠালাম তাতে জাহাজের টিকিট কিনে তোমরা আমেরিকায় চলে এসো। এখানে এসে জনস্টন হাউসে ওঠো। আমি তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব। তোমাদের আসার প্রতীক্ষায় রইলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যাকফারসনের নির্দেশমতো তাঁর স্ত্রী ও শ্যালিকা নিউ ইয়র্কে গিয়ে জনস্টন হাউসে তিন সপ্তাহ ছিলেন। কিন্তু ম্যাকফারসন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ না করায় অগত্যা তাঁরা ইংল্যান্ডে ফিরে এলেন। মনে হয়, খবরের কাগজ পড়ে ম্যাকফারসন ধারণা করেছিলেন যে তাঁকে ধরার জন্য পুলিশ তাঁর স্ত্রী ও শ্যালিকাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে।

গত আট বছর ধরে রহস্য এই পর্যায়ই থেমে ছিল। একটা ট্রেনের হারিয়ে যাওয়ার মতো অবিশ্বাস্য ও অভূতপূর্ব ঘটনার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। অবশ্য এটুকু জানা গেছল যে, মঁসিয়ে কারাতাল মধ্য আমেরিকার লোক এবং আর্থিকভাবে সম্পন্ন ও রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রভাবশালী। তাঁর বিশালদেহী সঙ্গীর নাম এডুয়ার্ডো গোমেজ এবং সে গুন্ডাপ্রকৃতির ও বদমেজাজের মানুষ। ক্ষীণতনু কারাতালের রক্ষী হিসেবেই সে এসেছিল। কারাতাল প্যারিসে কেন যেতে চাইছিলেন, তারও কোনও কারণ প্যারিসে খোঁজখবর করে পাওয়া গেল না।

১৮৯৮ সালে ফাঁসির আসামি হারবার্ট দ্য লেরনক-এর স্বীকারোক্তি প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা বলা হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার ঘটনার বাকিটুকু হারবার্টের স্বীকারোক্তির ভাষাতেই শোনা যাক ঃ

বড়াই করে বলার মতো অনেক কিছুই জীবনে করেছি। তবে সেসব আমি সাধারণত প্রকাশ করি না। কারাতাল সম্পর্কিত ঘটনাটা বলতে বাধ্য হচ্ছি, যাতে আমার শাস্তি লাঘব হয়। আপাতত ঘটনার সঙ্গে প্যারিসের রুই-কাতলারা যাঁরা জড়িয়ে ছিলেন তাঁদের নাম বলব না, তবে শাস্তি লাঘব না হলে সেসবও ফাঁস করে দেব। এখন বলি কীরকম সুনির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী বুদ্ধি খাটিয়ে আমি পুরো কাজটা করেছিলাম।

১৮৯০ সালে প্যারিসের আদালতে একটা বিখ্যাত মামলা চলছিল। রাজনীতি এবং আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত এই মামলায় ফ্রান্সের অনেক বিখ্যাত লোকই জড়িত ছিলেন। মঁসিয়ে কারাতাল প্যারিসে আসছিলেন এঁদের বিরুদ্ধে প্রমাণ নিয়ে। তিনি প্যারিসে এলেই এই মামলার ইতি হত এবং তথাকথিত সেই বিখ্যাত ব্যক্তিদের আসল রূপ জনসমক্ষে প্রকাশ পেত। সুতরাং ঠিক করা হল যে, কারাতালের প্যারিসে আসা যেভাবেই হোক আটকাতে হবে।

কয়েকজন লোক নিয়ে তৈরি একটা ছোট সংগঠনকে ভার দেওয়া হল পুরো ব্যাপারটা সামলানোর। প্রভূত অর্থ ও ক্ষমতার অধিকারী এই সংগঠনের দরকার ছিল এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন লোকের যে একাধারে বুদ্ধিমান, সাহসী, দৃঢ়চেতা ও সমস্তরকম পরিবেশের মোকাবিলা করতে সক্ষম—অর্থাৎ লাখে এক। তারা আমাকেই, এই কাজের জন্য নির্বাচন করেছিল। নিজের ঢাক পেটাচ্ছি না, তবে এটুকু বলতে পারি তাদের লোক নির্বাচনে কোনও খুঁত ছিল না।

প্রথমেই বিশ্বাসী একটা লোককে মধ্য আমেরিকায় মঁসিয়ে কারাতালের কাছে পাঠিয়ে দিলাম, যাতে তিনি আমার লোকের সঙ্গেই যাত্রা করেন। কিন্তু দুভার্গ্য! আমার লোকটা পৌঁছনোর আগেই কারাতাল রওনা হয়ে গেছেন। কিন্তু আমার কাছে বিকল্পের অভাব ছিল না—একটা উপায় ব্যর্থ হলে অন্য উপায়ের ব্যবস্থা ছিল। ভেবে দেখুন, পুরো কাজটা কী কঠিন! কারাতালকে খুন করা এমন কিছু একটা কাজ নয়। তাঁকে সরাতে হবে, তাঁর সঙ্গের নথিপত্র ইত্যাদি নষ্ট করতে হবে এবং তাঁর কোনও সঙ্গী থাকলে তাকেও ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

আমার কাছে খবর ছিল যে লিভারপুল থেকে লন্ডন পৌঁছনোর পরে কারাতালের সঙ্গে অনেক রক্ষী থাকবে। সুতরাং আমার যা করণীয় তা উনি লন্ডন পৌঁছনোর আগেই করতে হবে। ছ'রকম প্ল্যান বানিয়েছিলাম। একটা ব্যর্থ হলে অন্যটা কাজে লাগাতে হবে।

টাকায় সবকিছু হয়। প্রথমেই ইংল্যান্ডের রেলওয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপর এক বিশেষজ্ঞকে জোগাড় করে ফেললাম। এঁর মাধ্যমে রেলওয়ের কিছু অভিজ্ঞ কর্মচারীকেও আমার দলে টেনে নিলাম। পুরো প্ল্যানটা ওই বিশেষজ্ঞের তৈরি, আমি খালি খুঁটিনাটিগুলোর দিকে লক্ষ রেখেছিলাম। জেমস ম্যাকফারসনকে হাতে রাখলাম, কেন না কারাতাল যদি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেন, জেমস-এর তাতে গার্ড হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ষোলোআনা। ফায়ারম্যান স্মিথকে দলে নেওয়া হল। খালি ইঞ্জিন ড্রাইভার স্লেটারকে বাগানো গেল না—লোকটা একটু গোঁয়ার টাইপের। আমাদের মোটামুটি ধারণা ছিল যে কারাতাল স্পেশাল ট্রেনেই লিভারপুল থেকে লন্ডন যাবেন এবং সেখান থেকে প্যারিস। হাতে সময় কম থাকায় স্পেশাল ট্রেন নেওয়া ছাড়া তাঁর কোনও উপায় ছিল না। তাঁর জাহাজ লিভারপুল পৌঁছনোর আগেই আমার প্ল্যান তৈরি হয়ে গেছল। শুনলে মজা পাবেন, জাহাজটাকে যে পাইলট বোট বন্দরে নিয়ে এসেছিল, তাতেও আমার লোক ছিল।

কারাতালকে দেখেই আমরা বুঝেছিলাম যে তিনি বিপদের আশঙ্কা করছেন এবং খুবই সতর্ক। তাঁর রক্ষী গোমেজ লোকটা বিপজ্জনক ধরনের, দরকার হলে ও পিস্তল চালাতে পিছপা হবে না। নথিপত্রের বাক্সটাও তার হাতে। হয়তো সে কারাতালের প্যারিসে আসার কারণ সম্বন্ধেও অবহিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুতরাং গোমেজকে ছেড়ে শুধু কারাতালকে সরানো হবে নিতান্তই পণ্ডশ্রম। তাই দুজনের পরিণতি একই হতে হবে, এবং স্পেশাল ট্রেনে সেই পরিণতি ঘটানো বিশেষ সুবিধাজনক। ট্রেনের তিনজন কর্মচারীর মধ্যে দুজন আমাদের হাতের মুঠোয়, কেন না তাদের আরামদায়ক ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।

আমার একজন সঙ্গীকে লিভারপুলে রেখে আমি নিজে কেনিয়নের এক সরাইখানায় ওর ইঙ্গিতের অপেক্ষায় রইলাম। যেই কারাতাল স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করলেন আমার সঙ্গী তখনই হোরেস মূর নাম নিয়ে ওই ট্রেনেই তাঁদের সঙ্গে যাওয়ার চেষ্টা করল। এই প্ল্যান লেগে গেলে আমার সঙ্গী ওদের দুজনকেই ট্রেনে হত্যা করে সঙ্গের কাগজপত্রগুলো নষ্ট করে দিতে পারত। কিন্তু কারাতালের অনমনীয় মনোভাবের জন্য এই প্ল্যান কাজে লাগল না। আমার সঙ্গী তখন স্টেশন থেকে বেরিয়ে গিয়ে তারপর আর-একটা গেট দিয়ে আবার স্টেশনে এসে ওই স্পেশাল ট্রেনেই গার্ড ম্যাকফারসন-এর কামরায় ঢুকে পড়ল।

এবার বলি, আমি এদিকে কী করছিলাম। সব প্ল্যানই ছকা, শুধু ফিনিশিং টাচ দেওয়ার কাজ আমার। রেলের যে সাইডিংটা আমরা ব্যবহার করব বলে ঠিক করেছিলাম, সেটা মেনলাইন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছল। খানিকটা লাইন পেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটা জোড়া লাগানো হল। ফিশপ্লেট, বোল্ট, জোড়া লাগানোর পয়েন্ট ইত্যাদি দিয়ে আমাদের কেনা রেলের কিছু দক্ষ কর্মী কাজটা সহজেই নিখুঁতভাবে করে দিল। সুতরাং স্পেশালটা যখন হঠাৎ সামান্য ঝাঁকুনি খেয়ে মেনলাইন থেকে সাইডিং-এ চলে গেল, তখন কারাতাল ও গোমেজ কিছু বুঝতে পারলেন না।

প্ল্যানমাফিক ফায়ারম্যান স্মিথের কাজ ছিল ক্লোরোফর্ম দিয়ে ইঞ্জিন ড্রাইভার স্লেটারকে অচেতন করে দেওয়া, যাতে যাত্রী দুজনের সঙ্গে সে-ও অনন্তলোকে যাত্রা করে। কিন্তু এই ছোট্ট কাজটা করতে গিয়ে স্মিথ এমন তালগোল পাকিয়ে ফেলল যে স্লেটারের সঙ্গে তার ধস্তাধস্তি হল এবং ফলত স্লেটার ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙে মারা গেল।

আমার নিখুঁত প্ল্যানে এই একটিমাত্র ত্রুটি হয়েছিল এবং আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে আমার সুবিখ্যাত অপরাধ জীবনে এটি একটি কলঙ্ক হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। পরে অবশ্য আরও একটা গণ্ডগোল হয়েছিল। ট্রেনের গার্ড হতভাগা ম্যাকফারসন আমেরিকায় পৌঁছে ওর স্ত্রীকে যে একটা চিঠি লিখেছিল, সেটাও আমার পুরো প্ল্যানের মধ্যে আরেকটা খুঁত। অবশ্য তার জন্যে আমি দায়ী ছিলাম না।

হ্যাঁ, আবার ট্রেনের কথায় ফিরে আসি। এই ছোট্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু-কিলোমিটার লম্বা সাইড লাইনটা একটা অধুনা পরিত্যক্ত কয়লাখনিতে গিয়ে শেষ হয়েছিল। আপনারা জানতে চাইবেন, এই সাইডলাইন দিয়ে যাওয়ার সময় ট্রেনটা কারোর নজরে পড়েছিল কি না। আসলে এই রাস্তাটুকু ছিল অনেকটা সুড়ঙ্গের মতো—দু-দিকেই উঁচু জমি। ওই জমির ওপর গিয়ে না দাঁড়ালে ট্রেনটা কারোর চোখে পড়ার কথা নয়। একজনেরই সেটা চোখে পড়েছিল—সেটা এই অধমের চোখে। উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে কী দেখেছিলাম সেটা বলি।

আমার আর-একজন সঙ্গী চারজন সশস্ত্র লোককে নিয়ে লাইনের জোড় দেওয়া জায়গায় অপেক্ষা করছিল। মরচে ধরা লাইনে কোনও কারণে ট্রেনটা যদি আটকে যায়, যাত্রীদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া ছিল। কিন্তু ট্রেনটা সুচারুভাবে সাইডলাইনে যেতেই আমার এই সঙ্গীর কাজ শেষ হল। তখন আমি দুজন সশস্ত্র লোককে নিয়ে নাটকের বাকি অংশটুকুর প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

ট্রেনটা সাইডলাইন দিয়ে বেশ কিছুটা যাওয়ার পরেই ফায়ারম্যান স্মিথ গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই আবার গতি বাড়িয়ে দিয়ে স্মিথ, গার্ড ম্যাকফারসন আর আমার ইংরেজ সঙ্গী (ছদ্মনাম হোরেস মূর) তিনজনেই লাফ দিয়ে ট্রেনের বাইরে নেমে এল। গাড়ির গতি কমতেই যাত্রী দুজন একটু অবাক হয়েছিল। কিন্তু গতি আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়তে তারা দুজন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।

ওদের হতভম্ব অবস্থা দেখে আমার বেশ মজা লাগছিল। ভাবুন ব্যাপারটা—ট্রেনের বিলাসবহুল কোচে বসে আপনি হঠাৎ দেখলেন ট্রেনটা লাল-হলুদ রঙের মরচে পড়া একটা অব্যবহৃত লাইনের ওপর দিয়ে চলেছে। ওরা দুজনেই ততক্ষণে হয়তো বুঝতে পেরে গেছে যে পরের বড় স্টেশন ম্যানচেস্টারের বদলে ওরা পরলোকের দিকে এগিয়ে চলেছে।

চালকবিহীন ট্রেন তখন দুলতে-দুলতে ঝাঁকুনি খেতে-খেতে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে। মরচে ধরা লাইনের সংস্পর্শে এসে চাকা থেকে বিকট আওয়াজ হচ্ছে। আমি ওদের দুজনের মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। কারাতালের ঠোঁট নড়ছে—হয়তো ঈশ্বরের নাম নিচ্ছে। আর গোমেজকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা ষাঁড়কে কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হঠাৎ গোমেজ আমাদের দেখতে পেয়ে পাগলের মতো হাত নাড়তে লাগল। তার পরেই কবজির স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে হাতের ব্রিফকেসটা আমাদের দিকে ছুড়ে দিল। ভাবখানা এই—নথিপত্রগুলো সব নাও, কিন্তু আমাদের প্রাণে মেরো না। কিন্তু কোনও কাজে আমি দু-নম্বরি করি না। তা ছাড়া, ট্রেন তখন ওদের কেন, আমাদেরও নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

একটু পরেই ট্রেনটা যখন খনির অন্ধকার গহ্বরের কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসে পড়ল, তখন গোমেজের চেঁচামেচি বন্ধ হল। খনির নীচে যাওয়ার ও কয়লা ওপরে তোলার যে ষটান সুড়ঙ্গ আছে সেই অবধি আমরা লাইন পেতে রেখেছিলাম। ওদের দুজনের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। খনির অতল গহ্বরের আন্দাজ পেয়ে দুজনেই তখন বাকরুদ্ধ ও স্থাণু।

এত দ্রুতগতিতে চলা একটি ট্রেন কীভাবে গর্তে তলিয়ে যায় সেটা দেখার জন্য আমি একটু কৌতূহলীই ছিলাম।

প্রথমে ট্রেনটি খনির সুড়ঙ্গের উলটোদিকের দেওয়ালে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল। ইঞ্জিন, বগি দুটো, গার্ডের কামরা সব তালগোল পাকিয়ে এক হয়ে গেল। তারপর সেই পুরো জিনিসটা এক মুহূর্তের জন্যে গর্তের মুখের ওপর ঝুলে রইল। পরক্ষণেই লোহা, জ্বলন্ত কয়লা, পিতলের ফিটিংস, চাকা, কামরার কাঠের বেঞ্চি, গদি সবগুলো একসঙ্গে জট পাকিয়ে খনির অতল গহ্বরে চলে গেল। বিভিন্ন পদার্থের এই সমষ্টি খনিগহ্বরের দেওয়ালে ধাক্কা খেতে-খেতে নীচে যাওয়ার সময় তার যে আওয়াজ—স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। তারপরে দামামার নির্ঘোষের মতো একটা আওয়াজ শোনা গেল। বুঝলাম সবকিছু নীচে পৌঁছে গেছে। বয়লারটা মনে হয় ফেটে গেছল কারণ বিস্ফোরণের একটা শব্দ কানে এল।

একটু পরেই অন্ধকার গহ্বর থেকে বাষ্প ও কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আমাদের ঢেকে ফেলল। ধীরে-ধীরে সেই গলগল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে বেরোনো ধোঁয়া সরু সুতোর মতো হয়ে গেল। বাইরে তখন গ্রীষ্মের ঝলমলে বিকেল। খানিকক্ষণ পরে খনিটা আগের মতোই নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

এরপর আমাদের একটাই কাজ বাকি রইল—কৃতকর্মের কোনও চিহ্ন না রাখা। রেলকর্মীদের সেই ছোট্ট দলটি লাইন সংযোগের জায়গায় পাতা লাইন ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ চটপট সরিয়ে ফেলল। সবকিছু আবার আগের মতো হয়ে গেল। খনির ভেতরে ঢোকানো লাইনের অংশটুকু ও ট্রেনের ধ্বংসবশেষের কিছু টুকরো যেগুলো খনির মুখের কাছে ছিল, সেসব আমরা খনির গর্তে নিক্ষেপ করলাম। তারপর কোনওরকম তাড়াহুড়ো না করে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়লাম—আমি প্যারিসে, আমার এক সঙ্গী ম্যানচেস্টারে, ম্যাকফারসন জাহাজে করে আমেরিকায়। সে সময়ের খবরের কাগজ দেখলেই আপনারা বুঝবেন কত কুশলতায় আমরা এই কাজ করেছিলাম ও বিশ্বশ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভদের বোকা বানিয়েছিলাম।

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, গোমেজ ব্রিফকেসটা আমাদের দিকে ছুড়ে দিয়েছিল। আমি বলাবাহুল্য, সেটা আমার নিয়োগকর্তাদের ফেরত দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, তবে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে দু-একটা কাগজ আমি নিজের কাছে রেখে দিয়েছি। ওইসব কাগজ প্রকাশ করে দেওয়ার আমার কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইচ্ছে নেই। তবে সেই বিশেষ ব্যক্তিরা যদি আমার মুক্তির ব্যবস্থা না করেন, তা হলে কাগজগুলোর ব্যাপারে আমায় নতুন করে ভাবতে হবে। বিশ্বাস করুন, একা-একা মৃত্যুদণ্ড পেতে আমার একদম ভালো লাগে না।

মঁসিয়ে অমুক, জেনারেল তমুক—আমার কথা আপনারা শুনছেন তো? না শুনলে কিন্তু অমুক, তমুকের জায়গায় আসল নামগুলো বলে দেব।

পুনশ্চ ঃ আমার স্বীকারোক্তিতে একটা কথা বাদ গেছে। সেটা ওই ম্যাকফারসনের কথা। বোকার মতো ও স্ত্রীকে চিঠি লিখে ফেলেছিল। এইরকম লোককে বিশ্বাস করা কঠিন। ভবিষ্যতে যে-কোনও সময়ে ও স্ত্রীকে এই পুরো ঘটনাটা বলে দিতে পারত। তাই ও যাতে ওর স্ত্রীকে কোনওদিন আর দেখতে না পায় সেই ব্যবস্থাটাও করে দিয়েছিলাম। মাঝে-মাঝে মনে হয় ওর স্ত্রীকে চিঠি লিখে জানাই যে, তিনি চাইলে আবার বিয়ে করতে পারেন।

'The Lost Special' গল্পের অনুবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

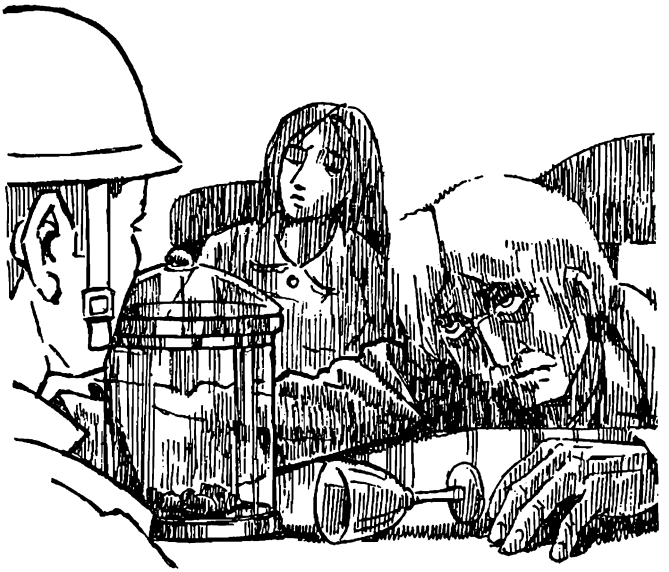

ক্যাভিয়ারের জার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর চিনে বক্সার বিদ্রোহ তখন শুকনো তৃণভূমিতে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ইউরোপীয়রা ছোট-ছোট দলে তাঁদের বাসস্থানের কাছাকাছি কোনও শক্ত ঘাঁটিতে আশ্রয় নিচ্ছেন। উদ্দেশ্য, সীমিত সামর্থ্য দিয়ে বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করে কোনওরকমে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা, যতক্ষণ না উদ্ধারকারী দল এসে পৌঁছোয়। বক্সার বিদ্রোহীদের অমানুষিক নিষ্ঠরতার কাহিনি এতই প্রচলিত যে, তাদের হাতে জীবন্ত ধরা পড়লে ভয়ংকর পরিণতি অনিবার্য,—একথা সবাই জানে।

কয়েকজন ইউরোপীয়ের একটি ছোট দল উত্তর চিনে ইচাও বলে একটি জায়গায় একটা ঘাঁটিতে চারদিন হল আশ্রয় নিয়েছেন। খাদ্য, অস্ত্রশস্ত্র সবই প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। পঞ্চাশ মাইল দূরে সমুদ্রতট। সেখানে ইউরোপীয় সেনাদের একটা ছোট ঘাঁটি আছে। সেই সৈন্যদল এসে উদ্ধার করবে এই আশায় অবরুদ্ধ ইউরোপীয় ক'জন অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত।

অবরুদ্ধদের দলে আছেন কয়েকজন ইউরোপিয়ান, একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমেরিকান ও কয়েকজন রেলকর্মী যাঁরা দেশি খ্রিস্টান। এই ছোট দলের নেতা একজন জার্মান—কর্নেল ড্রেসলার।

বিদ্রোহীরা ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে। ঘাঁটির ভাঙা দেওয়ালের গায়ের ছোট-ছোট ফোকরের মধ্য দিয়ে মাঝে-মাঝেই গুলি চালাচ্ছে এই দলটি। এতক্ষণে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে। এঁদের কাছে যে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ আছে তাতে হামলাকারীদের আর একদিনের বেশি ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। সুতরাং একদিনের মধ্যেই উদ্ধারকারীরা এসে পৌঁছবে, এই আশায় বেঁচে থাকা ছাড়া এঁদের আর কোনও উপায় ছিল না। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত সকলেই মোটামুটি নিশ্চিত যে উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা হবেই।

কিন্তু বুধবার সকাল থেকে তাঁদের আশায় ও বিশ্বাসে একটু চিড় ধরল। পাহাড় থেকে নীচে সমুদ্র অবধি ঢালু জমিতে কোনও ইউরোপীয় সেনার চিহ্ন নেই। অন্যদিকে বিদ্রোহীরা বিরামহীন চিৎকার করতে-করতে ক্রমাগত এগিয়ে আসছে। তাদের মুখভঙ্গি ভয়ংকর ও নিষ্ঠুর। ফরেন সার্ভিসের এক কর্মচারী এইন্সলি, তার শিকারের বন্দুক থেকে মাঝে-মাঝেই বিদ্রোহীদের দিকে গুলি ছুড়ছে। যে-কোনও সময়ে বিদ্রোহীদের কেউ একজন নিঃশব্দে তরোয়াল হাতে ভাঙা দেওয়াল টপকে ঘাঁটিতে ঢুকে পড়তে পারে।

বুধবার সন্ধেবেলায় এই পরিস্থিতিতে দলের সকলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু হতাশ হয়ে পড়লেন।

অবরুদ্ধ এই ক'টি মানুষের মতো কর্নেল ড্রেসলারের মুখে অবশ্য উদ্বেগের ছাপ নেই, কিন্তু তাঁর মনে পাষাণের বোঝা। রেলওয়ের অফিসার র‍্যালস্টন আত্মীয়স্বজনকে বিদায়ী চিঠি লিখেছেন। কীট-পতঙ্গের বিষয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানী বৃদ্ধ প্রফেসর মার্সার নীরব ও চিন্তামগ্ন। যুবক এইন্সলি-ও তার সহজাত চপলতা হারিয়ে ফেলেছে। মহিলারাই কেবল শান্ত ও স্থির। তাঁদের মধ্যে আছেন স্কটিশ মিশনের নার্স মিস সিনক্লেয়ার, মিসেস প্যাটারসন ও তাঁর মেয়ে জেসি। ফরাসি মিশনের ফাদার পিয়ের-ও শান্ত। আর আছেন স্কটিশ মিশনের মিঃ প্যাটারসন—খ্রিস্টধর্মের নীতিগত ব্যাপারে ফাদার পিয়ের-এর সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক আদায়-কাঁচকলায়। দুজনেই করিডোরে পায়চারি করছেন।

বুধবার রাতটা শেষ পর্যন্ত বিনা সমস্যায় কেটে গেল। বৃহস্পতিবারের সকালটা ছিল উজ্জ্বল ও মনোরম। দূরে একটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। তার পরেই দূর থেকে কে যেন জোরে চেঁচিয়ে বলল—সবাই আনন্দে থাকো, সাহায্য আসতে আর দেরি নেই। মনে হল ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সমুদ্রতটের সেই উদ্ধারকারী সেনাদল এসে পৌঁছবে। এদিকে কার্তুজ প্রায় শেষ। আধপেটা খাবারের বরাদ্দ আরও কম হওয়ার আশঙ্কা। কিন্তু এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। মেঘের ফাঁকে জীবনের এক ঝলক বিদ্যুৎ দেখা যাচ্ছে। সকলেই উৎফুল্ল আর প্রগলভ হয়ে উঠেছেন। সবাই জড় হলেন খাবার টেবিলে। এইন্সলি চেঁচিয়ে উঠল,—প্রফেসর, আপনার ক্যাভিয়ারের জারটা কোথায়? ওটা খুলুন, সবাই মিলে সেলিব্রেট করা যাক।

কর্নেল ড্রেসলারও বললেন,—ঠিকই তো! এই আনন্দের সময় ক্যাভিয়ারই উপযুক্ত খাবার।

মহিলারাও সকলে ক্যাভিয়ার খেতে চাইলেন।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে প্রফেসর মার্সারের জন্য কিছু জিনিস এসেছিল। তার মধ্যে ছিল এক জার ক্যাভিয়ার আর তিন বোতল দামি ওয়াইন। সবাই ঠিক করেছিলেন যে বিপদ কেটে গেলে এগুলি সদ্ব্যবহার করা হবে। বাইরের গুলির আওয়াজ এখন সঙ্গীতের মতো মধুর লাগছিল—কেন না গুলি চালাচ্ছিল উদ্ধারকারীরা। সুতরাং বাসি রুটির সঙ্গে সেই মহার্ঘ ক্যাভিয়ার খাওয়ার এই তো উপযুক্ত সময়।

কিন্তু প্রফেসর মাথা নাড়লেন, মুখে রহস্যময় হাসি। বললেন,—ওটা পরে খাওয়া যাবে। উদ্ধারকারী দলের এখানে পৌঁছতে আরও অনেক সময় লাগবে।

তখন রেলওয়ে কর্মচারী, ছোটখাটো চেহারা র‍্যালস্টন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন,—ওরা এখন মাত্র দশ মাইল দূরে আছে। ডিনারের আগেই এখানে এসে পড়বে।

এইসব আলোচনার মধ্যে এইন্সলি বলে উঠল,—বিদ্রোহীদের তো আগ্নেয়াস্ত্র বলতে কিছু নেই। আমাদের সৈন্যরা ওদের উড়িয়ে দিয়ে এক্ষুনি চলে আসবে। সুতরাং, প্রফেসর, ক্যাভিয়ারটা বের করুন না!

কিন্তু প্রফেসর তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। বললেন,—না। অন্তত ডিনার পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।

মিঃ প্যাটারসনও বললেন,—উদ্ধারকারীদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে তাঁদের ভালোভাবে আপ্যায়ন করা উচিত। ডিনারের সময় তাঁদের সঙ্গে সবাই মিলে ক্যাভিয়ারটা খাওয়া যাবে।

এই সিদ্ধান্ত সবাইয়েরই মনঃপূত হল। কেউ আর তারপর ক্যাভিয়ারের কথা তুললেন না।

প্যাটারসন বললেন,—আচ্ছা প্রফেসার, আপনি তো আগেও এইরকমভাবে একবার আটকে পড়েছিলেন। বলুন না সেই অভিজ্ঞতার কথা!

গম্ভীরভাবে প্রফেসর বললেন,—সেটা আঠারোশো উননব্বই সালের কথা। তখন আমি দক্ষিণ চিনের সুং-টোং-এ ছিলাম।

ফাদার পিয়ের জিগ্যেস করলেন,—কীভাবে আপনারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্ত হয়েছিলেন?

প্রফেসরের ক্লান্ত মুখের ওপর যেন কালো ছায়া পড়ল,—আমরা মুক্তি পাইনি।

—তার মানে বিদ্রোহীরা জায়গাটা দখল করে নেয়?

—হ্যাঁ।

—আর আপনি বেঁচে রইলেন?

—কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা করা ছাড়াও পেশায় আমি ডাক্তার। অনেকেই আহত হয়েছিল—তাদের চিকিৎসা করার জন্য ওরা আমায় প্রাণে মারেনি।

—আর সকলের কী হল?

প্রফেসর উত্তর দিলেন না, কিন্তু তাঁর নিষ্প্রভ চোখের ওপর বিভীষিকার ছায়া দেখে মহিলারাও অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠলেন।

ফাদার পিয়ের বললেন,—থাক! থাক! কিছু বলতে হবে না। আমাদের ওই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ব্যাপারে জানতে চাওয়া ঠিক হয়নি।

প্রফেসর ধীরে-ধীরে বললেন,—এসব কথা না জানাই ভালো।...ওই শুনুন, খুব কাছেই মনে হয় বন্দুক চালানো হচ্ছে!

সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরে চলে গেলেন ব্যাপারটা কী হচ্ছে দেখতে। ভৃত্যেরা এসে খাওয়ার টেবিল পরিষ্কার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে দিল। কিন্তু বৃদ্ধ প্রফেসর টেবিলের কাছেই বসে রইলেন—সাদা চুলে ঢাকা মাথাটা দু-হাতে ধরে। অতীতের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞাতর স্মৃতি তাঁকে বোধহয় গ্রাস করেছে। বাইরে বন্দুকের আওয়াজ থেমে গেলেও তিনি তা বুঝতে পারলেন না।

সেই সময় মুখে নিশ্চিন্ত হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন কর্নেল ড্রেসলার। দু-হাত ঘষতে-ঘষতে বললেন,—জার্মানির কাইজার নিশ্চয়ই খুশি হবেন। অবশ্যই আমি একটা বীরচক্র পাব। বার্লিনের কাগজে লেখা হবে—কর্নেল ড্রেসলারের নেতৃত্বে অল্প কয়েকজনের একটা ছোট্ট দল কীভাবে এই ভয়ঙ্কর বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করেছে।

প্রফেসর নিরাসক্তভাবে বললেন,—আমার দীর্ঘ জীবনে আমি ভাগ্যের এত অদ্ভুত খেলা দেখেছি যে, প্রকৃত পরিস্থিতি না জেনে আমি খুশিও হই না, দুঃখিতও হই না। কিন্তু আপনি বলুন ব্যাপারটা কী।

পাইপ ধরিয়ে বেতের চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে কর্নেল বললেন,—উদ্ধারকারীরা এসে পড়ল বলে। গুলির আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছে না। তার মানে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ শেষ। এইস্লিকে বলে রেখেছি, উদ্ধারকারীদের দেখতে পেলেই ও তিনবার গুলি ছুড়বে; তখন আমরা বেরিয়ে আসব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু পরে কর্নেল বললেন,—আচ্ছা প্রফেসর এখন তো এখানে মহিলারা বা অন্য কেউ নেই। সুং-টোং-এর ঘটনাটা বলুন না আমাকে!

—সে অভিজ্ঞতা বিভীষিকায় ভরা।

—না, আমি অন্য কারণে জানতে চাইছি। এই যে এখানে আমরা শত্রুদের কোনওরকমে আটকে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছি, সুং-টোং-এ কি এরকম কিছু করা যেত না?

—সবকিছুই করা হয়েছিল। খালি ভুল হয়েছিল একটা ব্যাপারে। বিদ্রোহীদের হাতে মহিলাদের পড়ে যাওয়া। আগে বুঝতে পারলে ওদের হাতে ধরা পড়ার আগে আমি নিজেই মহিলাদের হত্যা করতাম। জানেন, ওই ঘটনার পরে আমি আজ পর্যন্ত কোনও রাতে শান্তিতে ঘুমোতে পারিনি। আমাকে ওরা একটা পোল-এ বেঁধে রেখে আমার চোখের আশেপাশে এমনভাবে কাঁটা বিঁধিয়ে দিয়েছিল যে আমি যেন চোখ বন্ধ না করতে পারি। মহিলাদের ওপর সেই অমানুষিক অত্যাচার নিরুপায়ভাবে দেখতে-দেখতে আমি ভাবছিলাম যে মাত্র কয়েকটা ট্যাবলেটের সাহায্যে সম্পূর্ণ বেদনাহীন মৃত্যু উপহার দিয়ে ওই মহিলাদের সেই অত্যাচার থেকে বাঁচাতে পারিনি কেন। এই পাপের জন্য ভগবানের কাছে জবাবদিহি করতে আমি প্রস্তুত। এইরকম ঘটনা আবার হলে যদি মহিলাদের হত্যা না করে বিদ্রোহীদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে ছেড়ে দিই, তা হলে নরকেও আমার স্থান হবে না।

কর্নেল প্রফেসারের হাত চেপে ধরে বললেন,—আপনি ঠিকই বলেছেন। এখানেও যদি আমরা শত্রুদের কবলে পড়তাম, তা হলে আপনারই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওই ব্যবস্থা করতে হত।...কিন্তু এইন্সলির বন্দুকের আওয়াজ এখনও শুনতে পাচ্ছি না কেন? দেখে আসি কী ব্যাপার।

এরপর অনেকক্ষণ কেটে গেল। প্রফেসর চুপচাপ বসে আছেন। না কোনও বন্দুকের আওয়াজ, না উদ্ধারকারীদের আগমনবার্তা। বাধ্য হয়ে তিনি নিজেই উঠে বাইরে দেখতে যাবেন, এমনসময় ঘরে ঢুকলেন কর্নেল ড্রেসলার—মুখ ছাইয়ের মতো সাদা। বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করছে। কয়েক ঢোক ব্র্যান্ডি খেয়ে কর্নেল বললেন,—সর্বনাশ হয়েছে। বিদ্রোহীরা উদ্ধারকারীদের আটকে দিয়েছে। উদ্ধারকারীদের গোলাবারুদও প্রায় শেষ। আগামী তিনদিনের মধ্যে ওদের এখানে আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। ব্রিটিশ কমোডোর ওয়াইন্ডহ্যাম একজন স্থানীয় সেপাইকে দিয়ে এই খবর পাঠিয়েছেন। গুরুতর আহত ওই সেপাই আমায় সবকিছু বলল। আপাতত আমি আর আপনি ছাড়া এই ব্যাপারটি কেউ জানে না।

—সেই সেপাইটা কোথায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য সে এইমাত্র মারা গেল। লাশটা গেটের কাছেই পড়ে আছে।

—কেউ ওকে দেখেছে কি?

—এইন্সলি হয়তো দেখে থাকবে। সেক্ষেত্রে পুরো ব্যাপারটাই আমাদের দলের সবাই জেনে যাবে। আমাদের হাতে দু-এক ঘণ্টার বেশি সময় নেই। বিদ্রোহীরা তার মধ্যেই এসে এই ঘাঁটি দখল করে নেবে আর আমরা বন্দি হব।

—আমাদের কি কোনও আশাই নেই?

—বিন্দুমাত্র না।

হঠাৎ তখন ঘরের মধ্যে দলের পুরুষেরা সকলে ঢুকে পড়লেন। সবায়ের এক প্রশ্ন,—কর্নেল, আপনার কাছে কি কিছু খবর আছে?

কর্নেল জবাব দেওয়ার আগেই প্রফেসর বললেন,—সবকিছু ঠিক আছে। উদ্ধারকারীরা আপাতত একটু আটকে পড়েছে—কাল ভোরেই পৌঁছে যাবে। বিপদের কোনও আশঙ্কা নেই।

খুশিতে ঝলমল করে উঠল সকলের মুখ। কর্নেল তবুও প্রত্যেককে সাবধান থাকতে ও নিজের-নিজের পাহারার জায়গায় ফিরে যেতে বললেন। সবাই চলে গেলে কর্নেল প্রফেসারের দিকে তাকালেন। দৃষ্টির অর্থ পরিষ্কার ঃ 'এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবকিছুই আপনার হাতে।' প্রফেসরের মুখে সামান্য হাসি—কিছুটা বিষাদের, কিছুটা কাঠিন্যের।

পুরো দুপুরটা কাটল নিস্তব্ধতায়। কর্নেল বুঝতে পারলেন যে, বিদ্রোহীরা চুপচাপ তৈরি হয়ে এখন অন্তিম আক্রমণের অপেক্ষায়। কিন্তু দলের আর সকলে ভাবল যে, বিদ্রোহীরা এতক্ষণে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হয়েছে।

সান্ধ্য আহারের জন্যে দলের সবাই টেবিলে এলেন। সবাই খুশিতে ডগমগ। প্রথমেই দামি ওয়াইনের তিনটে বোতল খোলা হল। তারপরে সেই বিখ্যাত, মহার্ঘ ক্যাভিয়ারের জারটা। জারটা বেশ বড়—সবাই বড় এক চামচ করে ক্যাভিয়ার নেওয়ার পরেও অনেকটা ক্যাভিয়ার রইল। র‍্যালস্টন আর এইন্সলি আরও এক চামচ করে নিলেন। প্রফেসর ও কর্নেল পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে এক চামচ করে ক্যাভিয়ার নিলেন। মহিলারাও আনন্দ করে খেতে লাগলেন। নিল না খালি মিস প্যাটারসন—ক্যাভিয়ারের নোনতা ঝাঁজালো স্বাদ তার ভালো লাগে না।

প্রফেসরের অনেক অনুরোধেও মিস প্যাটারসন যখন ক্যাভিয়ার খেল না, তখন হঠাৎ খানিকটা উত্তেজিত হয়ে প্রফেসর বললেন,—আজ রাতে ক্যাভিয়ার না খাওয়াটা স্রেফ বোকামি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিস্থিতি সামলালেন মা মিসেস প্যাটারসন। উনি মেয়ের প্লেটের ক্যাভিয়ারটুকু ছুরি দিয়ে চেঁছে নিজের প্লেটে তুলে নিলেন। বললেন,—প্রফেসর, এবার তো আপনি খুশি?

প্রফেসর কিন্তু মোটেই খুশি হলেন না। হঠাৎ কোনও বাধার সম্মুখীন হলে মানুষের মনে যে বিরক্তি মেশানো হতাশার অনুভূতি হয়, তাঁর মুখের ভাব অনেকটা সেইরকম।

সবাই জমিয়ে গল্প করতে লাগলেন। এখান থেকে মুক্তির পরে কে কী করবেন—সেই নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। ফাদার পিয়ের চিনের অন্য শহরে যাবেন আর একটা মিশন গড়তে। মিঃ প্যাটারসন মাস তিনেকের জন্য ফিরবেন স্কটল্যান্ডে—মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে।

নার্স মিস সিনক্লেয়ার বললেন,—এই ধকলের পর সকলেরই একটু বিশ্রাম দরকার। দেখুন না, আমার শরীরটা কীরকম করছে—কানের মধ্যে যেন অসংখ্য ঝিঁঝি পোকা ডাকছে।

এইন্সলি বলল,—আরে! আমারও তো তাই হচ্ছে। যেন বড় একটা নীল মাছি কানের মধ্যে ঢুকে দাপাদাপি করছে। যাই হোক, এখান থেকে আমি পিকিং-এ চলে যাব ভাবছি। র‍্যালস্টন, তোমার কী প্ল্যান?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আমি তো মৃত্যু নিশ্চিত জেনে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের চিঠি লিখে ফেলেছিলাম। শুধু চিঠিগুলো ডাকে দেওয়া হয়নি। ওগুলোকে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে নিজের কাছে রাখব—মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরে আসার স্মৃতি। আর ভাবছি। কোনও রৌদ্রোজ্বল জায়গায় গিয়ে কিছুদিন ছুটি কাটাব।

এইন্সলি বলল,—কী হল কর্নেল? আপনাকে কেমন যেন ম্রিয়মাণ লাগছে!

—না, না, আমি ঠিক আছি।

—আসুন, আমরা সকলে কর্নেলের স্বাস্থ্য কামনা করি। ওঁর জন্যেই আমরা আজ এই পরীক্ষায় সফল হয়েছি।

সবাই উঠে দাঁড়িয়ে ওয়াইনের গ্লাস উঁচু করে কর্নেলকে ধন্যবাদ জানালেন।

কর্নেল বললেন,—আমি যথাসাধ্য করেছি। আজকে যদি আমরা নিজেদের বাঁচাতে ব্যর্থ হতাম, তা হলেও আপনারা আমাকে দোষ দিতে পারতেন না।

মিঃ প্যাটারসন বললেন,—কর্নেল, আমাদের সকলের পক্ষ থেকে—ও কী! র‍্যালস্টনের কী হল?

হাতদুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে গভীর ঘুমে মগ্ন র‍্যালস্টন।

প্রফেসর তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—চিন্তার কিছু নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের সবাইয়ের যে অবস্থা, তাতে ক্লান্তির জন্যে ওরকম নেতিয়ে পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিশেষত আজ রাতে।

মিসেস প্যাটারসন বললেন,—আমারও ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। মাথা তুলে রাখতে পারছি না। বলতে-বলতেই চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুঝলেন তিনি।

মিঃ প্যাটারসন বললেন,—এইরকম ওর কখনও হয়নি—আশ্চর্য! খাওয়ার টেবিলেই ঘুমিয়ে পড়ল! কিন্তু ঘরের ভেতরটা কেমন যেন বদ্ধ লাগছে! আর খুব গরম লাগছে। আমিও আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব।

এইন্সলি কিন্তু ফূর্তিতে বকবক করেই যাচ্ছিল। হাতে ওয়াইনের গ্লাসটা নিয়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলল,—আসুন, সবাই মিলে আর একটু ওয়াইন খেয়ে গানটান করি। এক সপ্তাহ ধরে আমরা বিভিন্ন দেশের লোক হয়েও বন্ধুর মতো থেকেছি, পরস্পরকে জানার সুযোগ পেয়েছি। কর্নেল জার্মানির প্রতিনিধি। ফাদার পিয়ের ফ্রান্সের। প্রফেসর আমেরিকার লোক। আমি আর র‍্যালস্টন ব্রিটেনের। আর এই মহিলারা—এই বিপদের দিনে এঁরা ছিলেন করুণা ও সহনশীলতার প্রতিমূর্তি। আসুন, মহিলাদের স্বাস্থ্য কামনা করে ওয়াইনে চুমুক দিই। আরে! এ কী! কর্নেলকে দেখুন! উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলতে-বলতেই এইন্সলির হাত থেকে গ্লাসটা পড়ে গেল আর ও বিড়বিড় করে কী বলতে-বলতে ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ল। নার্স মিস সিনক্লেয়ারও মূর্ছাহত ফুলের মতো চেয়ারের হাতলের দিকে ঝুঁকে বসে—কোনও সাড় নেই।

মিঃ প্যাটারসন হঠাৎ উঠে পড়ে চারদিকে তাকিয়ে মেয়েকে বললেন,—জেসি, ব্যাপারটা কেমন অস্বাভাবিক না। সকলেই কেন একে-একে ঘুমিয়ে পড়ছে? ওই দ্যাখো, ফাদার পিয়েরও নিদ্রামগ্ন। জেসি, তোমার মায়ের গা এত ঠান্ডা কেন? ও কি ঘুমোচ্ছে? না কি মারা গেছে? কে কোথায় আছ—জানলাগুলোও খুলে দাও!

জানলার দিকে টলতে-টলতে এগিয়ে গিয়ে মাঝপথে হাঁটু মুড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন মিঃ প্যাটারসন।

আতঙ্কে বিহ্বল মিস প্যাটারসন চারদিকে ছড়ানো নিষ্পন্দ দেহগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল,—প্রফেসর মার্সার! কী হয়েছে বলুন তো? এরা কি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে? না-না, মনে হচ্ছে সকলেই মারা গেছে।

বৃদ্ধ প্রফেসরের চোখেও তখন মৃত্যুর অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে কোনওরকমে দাঁড়িয়ে উঠে জড়িয়ে-জড়িয়ে বললেন,—জেসি, তোমাকে এসব কিছুই দেখতে হত না। শরীর বা মনে কোনও বেদনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা যন্ত্রণা হত না। সায়ানাইড! ক্যাভিয়ারে মিশিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি কিছুতেই খেলে না।

আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে পিছোতে-পিছোতে জেসি বলল,—শয়তান! রাক্ষস! তুমি ওদের সবাইকে বিষ খাইয়েছ!

—না, না, আমি ওদের বাঁচিয়েছি। তুমি তো বিদ্রোহীদের জানো না—তারা কী ভয়ানক! আর এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা ওদের হাতে ধরা পড়তাম। এসো, এখন খেয়ে নাও একটু ক্যাভিয়ার।

ঘরের জানলার বাইরেই এমন সময় গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

—ওই শোনো! ওরা এসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি করো। এখনও ওদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারো।

কিন্তু প্রফেসরের পুরো কথা শোনার আগেই জেসি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। বৃদ্ধ প্রফেসর কান পেতে বাইরের আওয়াজ শুনতে লাগলেন। কিন্তু, হে ভগবান, এ কীসের আওয়াজ শুনছি? আমি কি পাগল হয়ে গেলাম? না কি এ বিষক্রিয়ার ফল? এ তো ইউরোপিয়ানদের জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে! ইংরেজিতে কেউ নির্দেশ দিচ্ছে। না, সন্দেহের আর কোনও অবকাশ নেই। কোনও অবিশ্বাস্য উপায়ে আশাতীতভাবে উদ্ধারকারীরা এসে পড়েছে। হতাশায় দু-হাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপরে তুলে প্রফেসর মার্সার আর্তনাদ করে উঠলেন,—হায় ঈশ্বর! এ আমি কী করলাম!

কমোডোর ওয়াইল্ডহ্যাম-ই প্রথম ঢুকলেন সেই মৃত্যুপুরীতে। খাওয়ার টেবিলের চারদিকে নিষ্পন্দ সাদা চামড়ার কিছু মানুষ। কেবলমাত্র একটি মেয়ে সামান্য গোঙানির মতো আওয়াজ করছে আর একটু যেন নড়াচড়া করছে। ঘরের মধ্যে এমন একজনও নেই যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ শেষ কাজটি করতে পারে। তখনই বাক্‌রুদ্ধ কমোডোর দেখলেন যে পাকা চুলে ঢাকা মাথা টেবিল থেকে তুলে এক মুহূর্তের জন্য টলতে-টলতে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর মার্সার। তাঁর গলা থেকে কোনওরকমে একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোল—সাবধান! ভগবানের দোহাই! ওই ক্যাভিয়ার ছোঁবেন না!

তার পরেই ঢলে পড়লেন প্রফেসর। সম্পূর্ণ হল মরণ-বৃত্ত।

'The Pot of Caviare' গল্পের অনুবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই হাতটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রিটিশ আমলে ভারতের বিখ্যাত শল্যচিকিৎসাবিদ আমার কাকা স্যার ডোমিনিক হোল্‌ডেন যে আমাকে তাঁর বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে গেছেন, এ কথা সকলরই জানা। কিন্তু আর পাঁচজন সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীকে অগ্রাহ্য করে কেন তিনি আমাকেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেলেন তার কারণ অনেকেই জানেন না। তাঁর বদান্যতায় একজন সাধারণ পশারের ডাক্তার থেকে আমি রাতারাতি এক প্রভূত বিত্তশালী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়েছি। খুব কম লোকই জানেন যে স্যার ডোমিনিকের জীবনের শেষ ক'টা বছরে আমি তাঁর জন্য যা করেছিলাম, তা আর কারও পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। সেই ব্যাপারটাই আজ খুলে বলছি—বিশ্বাস করা না করা আপনাদের ওপর।

স্যার ডোমিনিক কর্মজীবন শুরু করেন ব্রিটিশ সেনাদলের ডাক্তার হিসেবে। পরে বোম্বেতে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে তিনি প্রভূত সুনাম অর্জন করেন। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে তাঁর প্রায়ই ডাক পড়ত। তা ছাড়া বোম্বেতে তিনি একটা হাসপাতালও শুরু করেন, এবং সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসপাতালের পরিচালনার কাজে নিজে যুক্ত ছিলেন। এত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ধীরে-ধীরে ভেঙে পড়ল। তখন বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের উপদেশে তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে গেলেন। উইল্টশায়ারে অনেক জমিজমা ও একটি জমিদারবাড়ি কিনে ওখানেই থাকতেন। তুলানমূলক প্যাথোলজি ছিল তাঁর প্রিয় বিষয় এবং তারই চর্চা করে সময় কাটাতেন।

আমাদের পরিবারের সকলেই এই ধনী ও নিঃসন্তান আত্মীয়ের দেশে ফিরে আসাতে, বলা বাহুল্য, খুব খুশি হয়েছিল। কাকাও মাঝে-মাঝেই এক এক করে তাঁর ভাইপো, ভাইঝিদের ওখানে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ পাঠাতেন। অবশ্য ওখানে গিয়ে কারওরই খুব একটা ভালো লাগত না। যাই হোক, আমারও একদিন আমন্ত্রণ এল ওখানে যাওয়ার। কিন্তু আমার একার, সপরিবার নয়।

প্রথমে ভেবেছিলাম যাব না। তারপর সাতপাঁচ ভেবে অক্টোবরের এক দুপুরে উইল্টশায়ারের দিকে রওনা হলাম। তখনও জানি না এই যাত্রার পরিণতি কী।

ভিনটন স্টেশনে যখন নামলাম ততক্ষণে দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। উইল্টশায়ারের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিচিত্র লাগল। জায়গাটা উপত্যকার মতো—চারদিকে কৃষিজমি আর ছড়ানো ছিটোনো কৃষকদের ঘরবাড়ি। সমতল জমির পরেই শুরু হয়েছে সাদা-সাদা চকের পাহাড়, পাহাড়গুলোর ওপরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোল, চৌকোনা প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের প্রাচীর—অনেকটা দূর্গের প্রাচীরের মতো। কয়েকশো বছর আগে এই প্রাচীরগুলো কারা তৈরি করেছিল—ব্রিটিশরা না রোমানরা—এ নিয়ে মতভেদ আছে। পাহাড়ের গায়ে ঢেউ-খেলানো জমির ওপরেও গোল গোল ঢিপি।

এই বিচিত্র পরিবেশে কাকার বাড়িটা বেশ মানিয়ে গেছে। গেটের স্তম্ভদুটো ভাঙা ও শ্যাওলা-ধরা। গেট থেকে বাড়ি অবধি পাথর ছড়ানো রাস্তাটার যত্ন হয়নি বহুদিন। হেমন্তের ঝরা পাতা ঠান্ডা হাওয়ায় এলোমেলো উড়ছে। এল্‌ম গাছের সারির ফাঁক দিয়ে দূরে বাড়ি থেকে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। সন্ধের আবছা আলোয় বাড়িটা দেখতে পেলাম—লম্বা, নীচু ধরনের। পুরোনো আমলের স্থাপত্যের ছাপ—ঢালু ছাদ, টালি দেওয়া, দেওয়ালের গায়ে কাঠের সাপোর্ট। গাড়িবারান্দা থেকে বাড়িতে ঢোকার দরজার পাশেই একটা চওড়া জানলা। সেই জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম, ঘরের মধ্যে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। ওই ঘরটাই কাকার স্টাডি। বাড়ির বুড়ো এক পরিচারক আমাকে ওই ঘরেই নিয়ে গেল।

শীতের কাঁপুনি থেকে বাঁচতে কাকা ফায়ার প্লেসের কাছেই ঝুঁকে বসেছিলেন। ঘরে তখনও কোনও বাতি জ্বালানো হয়নি। ওই আগুনের আলোয় দেখলাম কাকাকে—বিশাল মুখমণ্ডল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেহারায় পাহাড়ের রুক্ষতা, নাক ও গাল রেড ইন্ডিয়ানদের মতো, থুতনি থেকে চোখের কোণ অবধি চামড়ার ওপর অজস্র আঁকিবুঁকি। আমাকে দেখেই কাকা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন। ঘরে এবার একটা বাতি জ্বালানো হল। ঘন ভ্রূ-র নীচে থেকে তাঁর তীক্ষ্ণ দুটি চোখ আমাকে যে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করছে, তা বুঝতে পারলাম।

আমিও ততক্ষণে কাকাকে ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। শরীরের গঠন প্রায় দৈত্যের মতো, কিন্তু শরীরটা এত শুকিয়ে গেছে, যে চওড়া হাড্ডিসার কাঁধের থেকে ঝোলানো কোটটা দেখে মনে হচ্ছিল যে, ওটা যেন হ্যাঙার থেকে ঝুলছে। চওড়া কবজিটা যেন শুধু হাড় দিয়ে তৈরি—হাতের শিরাগুলি বিশেষভাবে প্রকট। জীবিকায় সফল ও শারীরিকভাবে সমর্থ একজন মানুষের চোখে যে সাফল্য ও সন্তুষ্টির ঔজ্জ্বল্য থাকে, তা নেই। চোখে একটা সন্ত্রস্ত ভাব—যেন কোনও অজানা বিপদের ছায়া। মনে হয়, স্যার ডোমিনিকের অদম্য জীবনীশক্তিকে যেন কেউ শুষে নিয়েছে। আমার ডাক্তারি বুদ্ধিতে মনে হল, কাকার হয়তো কোনও মারাত্মক রোগ হয়েছে এবং আসন্ন মৃত্যু চিন্তায় তিনি সন্ত্রস্ত। অবশ্য পরে বুঝেছিলাম, আমার সিদ্ধান্ত ভুল।

আগেই বলেছি, কাকার অভ্যর্থনায় উষ্ণতার কোনও অভাব ছিল না। ঘণ্টাখানেক পরে কাকা ও কাকিমার সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিনারে বসলাম। পরিবেশন করছে একজন ভারতীয় পরিচারক।

আমার কাকিমা লেডি হোলডেন ছোটখাটো চেহারার মানুষ, চোখে যুগপৎ মমতা ও সতর্কতার ছাপ। দুজন সারা জীবন বিভিন্ন পরিবেশে অনেক লোকজনের মধ্যে কাটিয়ে আজ জীবন-সায়াহ্নে এই নির্জন পরিবেশে কেবল পরস্পরের সাহচর্য্যে দিন কাটাচ্ছেন।

ডিনারের সময় কথাবার্তা ও হাসিঠাট্টা চলতে থাকলেও এটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, ওদের দুজনের চোখেই কোনও অজানা আতঙ্কের ছায়া। খানিকটা জোর করেই যেন ওঁরা পরিস্থিতিটাকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছেন।

খাওয়ার পরে ওয়াইনের গ্লাস হাতে একটু গল্পগুজব হল। কীভাবে জানি না গল্পের বিষয়টা চলে গেল অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার দিকে। কথায়-কথায় আমি ওঁদের বললাম যে ডাক্তার হিসেবে আমার বিশেষজ্ঞতা স্নায়ুসম্বন্ধিত অসুখের ব্যাপারে। এমনকী কয়েকজন ডাক্তারবন্ধু মিলে ভূতুড়ে বাড়িতেও রাত কাটিয়েছি—যদিও বলার মতো তেমন কিছু উত্তেজক অভিজ্ঞতা হয়নি। কাকা-কাকিমা দুজনেই খুব মন দিয়ে আমার কথা শুনছিলেন। মাঝে-মাঝেই অর্থপূর্ণভাবে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করছিলেন। একটু পরে কাকিমা শুতে চলে গেলেন।

এরপর কাকা একটা চুরুট ধরালেন। চুরুট ধরানোর সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার কাঁপতে থাকা হাত আর মুখের ভাব দেখে মনে হল তিনি আমাকে কিছু গোপন কথা জানাতে চান। ঠিক তাই! একটু পরেই কাকা বললেন,—তোমারই মতো একজনের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাইছিলাম। অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক ব্যাপারে তোমার যে যথেষ্ট উৎসাহ ও জ্ঞান আছে, সেটা বুঝতে পারছি। শুধু তাই নয়, এসব বিষয়ের একটা যুক্তিগ্রাহ্য ও দার্শনিক দিকও আছে—সেটাও তুমি জানো। তোমার মাথাও ঠান্ডা। ভূতপ্রেত দেখলে তুমি কি ঘাবড়ে যাবে?

—মোটেই না। বরং এসব ব্যাপারে আমি খুব উৎসাহী।

—আশাকরি বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকেই তুমি এসব ব্যাপার দ্যাখো।

—অবশ্যই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাকা বললেন,—জানো, হার্ডএকর, আমি আগে ঠিক তোমার মতোই ছিলাম। ইন্ডিয়ায় সবাই আমার সাহস ও শক্ত নার্ভ দেখে অবাক হয়ে যেত। এমনকী সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও আমি একটুও ঘাবড়াইনি। আর আজ? এই অঞ্চলে আমার মতো ভীতু লোক একটাও পাবে না। তুমিও অবশ্য খুব বেশি সাহস দেখাতে যেও না—তা হলে তোমার অবস্থা আমার মতোই হয়ে যেতে পারে।

আমার উৎসাহ দেখে কাকা আবার শুরু করলেন,—কয়েক বছর হল একটা অদ্ভুত কারণে আমার ও তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাকিমার জীবন থেকে সুখ-শান্তি চলে গেছে। কারণটা শুনলে অনেকেই হয়তো হেসে ফেলবে। কিন্তু এই ব্যাপারটার সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ করে আমরা দুজনেই শেষ হয়ে গেলাম।

—ব্যাপারটা কী, একটু খুলে বলবেন?

—আগে থেকে সেটা বলে দিলে হয়তো তুমি স্বাধীনভাবে জিনিসটার বিচার করতে পারবে না। তুমি নিজের চোখেই সবকিছু দেখলে ভালো হয়। আমার সঙ্গে একটু এদিকে এসো।

খাওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে একটা লম্বা প্যাসেজের শেষে বেশ বড় একটা ঘরে আমরা এলাম। ঘরটা একটা ল্যাবরেটরি —অনেক যন্ত্রপাতিতে ভরা আর দেওয়াল জোড়া তাকে অজস্র কাচের জার রাখা।

কাকা বললেন,—মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশাল সংগ্রহ ছিল আমার। বোম্বেতে আমার বাড়িতে আগুন লেগে তার অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে যায়। যা অবশিষ্ট ছিল, সেগুলোই এখানে দেখতে পাচ্ছ।

ভারতের বিভিন্ন জায়গার মানুষের শরীরের অস্বাভাবিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জারগুলিতে রাখা—ফুলে যাওয়া লিভার বা কিডনি, বাঁকা হাত-পা, বিচিত্র রকমের সিস্ট, বিকৃত বা অসুস্থ কোনও অঙ্গ।

কাকা বললেন,—তুমি যদি এ ঘরেই রাতটা কাটাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে ভালো হয়। এই ডিভানটাতে শুতে পারো। কোনওরকম আপত্তি থাকলে আমায় বলো।

—না, না। কোনও আপত্তি নেই।

—বাইরের প্যাসেজে বাঁ-দিকে দ্বিতীয় ঘরটা আমার। দরকার পড়লেই আমায় কিন্তু ডেকো। আমার তো রাতে ভালো ঘুম হয় না। তুমি ডাকলেই আমি চলে আসব।

কাকা চলে যেতেই ল্যাবরেটরির দরজা বন্ধ করে আমি ডিভানে শুয়ে পড়লাম। আমার শারীরিক শক্তি আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই। আর ভয়ের কথা যদি আসে, এটুকু বলতে পারি যে মানুষের মস্তিষ্কে এক সময় একটিমাত্র মানসিক অবস্থা থাকতে পারে। অর্থাৎ, এই অলৌকিক রহস্য উন্মোচনের জন্য যে উৎসাহ ও কৌতূহল এই মুহূর্তে আমার সত্তাকে আচ্ছন্ন করেছে, সেখানে ভয়ের কোনও স্থান নেই। খেলা শুরুর আগে একজন খেলোয়াড় যেমন উত্তেজনা মেশানো উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষা করে, আমার মানসিক অবস্থাও তখন সেইরকম।

ঘরটাকে অবশ্য কোনওভাবেই আদর্শ শয়নকক্ষ বলা যাবে না। বিভিন্ন কেমিক্যালের গন্ধে ভরা। তা ছাড়া, জারে রাখা বিকৃত ও অসুস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকেও ঘুম আসার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক বলা যায় না। আমি মোমবাতিটা নিভিয়ে দিতেই দেখলাম, জানালার মধ্য দিয়ে চাঁদের আলো ঘরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা অংশকে আলোকিত করেছে। সবকিছু মিলিয়ে আলো-আঁধারিতে পরিবেশটা একটু ভূতুড়েই লাগছিল। পুরো বাড়িটা এত নিস্তব্ধ যে বাইরে হাওয়ায় গাছের পাতা বা শাখা নড়ার আওয়াজও শোনা যাচ্ছিল। এপাশ ওপাশ করে কিছুক্ষণ ঝিমিয়ে থেকে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম—একেবারে গভীর, স্বপ্নহীন ঘুম।

হঠাৎ ঘরের ভেতর একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে একটু উঠে চারদিকে তাকালাম। কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছল—কেন না চাঁদের আলো সরতে-সরতে এখন আমার বিছানার কাছাকাছি এসে গেছে। বাকি পুরো ঘরটা ছায়াচ্ছন্ন। আস্তে-আস্তে অন্ধকারে চোখ সয়ে গেলে দেখলাম কিছু একটা চলাফেরা করছে—দেওয়ালের ধার ঘেঁষে। বেশ রোমাঞ্চকর ব্যাপার। আমার বিছানার কাছে আলোকিত জায়গার পাশে যখন জিনিসটা এসে গেল, বুঝলাম সেটা একটা মানুষের আকৃতি। চেহারাটা ছোটখাটো কিন্তু ষণ্ডা গোছের, শরীরটা একটা আলখাল্লায় ঢাকা। তার মুখের ওপর চাঁদের আলো পড়তে দেখলাম, মুখের রং অনেকটা চকোলেটের মতো আর মাথায় চুলে একটা ঝুঁটি বাঁধা। ধীরে-ধীরে হেঁটে সে প্রত্যেকটা জারের ভেতরের বস্তু নিবিষ্টচিত্তে নিরীক্ষণ করছিল—একটার পর একটা। জার রাখার তাক শেষ হয়েছে আমার বিছানার কাছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওখানে এসে সে হঠাৎ থেমে আমার দিকে তাকাল আর হতাশার ভঙ্গিতে দু-হাত শূন্যে ছুড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'হাত' বলা হয়তো ঠিক হল না—লোকটা বাহু দুটো তুলেছিল। বাহু ওপরে তোলার সময় আলখাল্লার আস্তিন নেমে আসতেই ওর বাঁ-হাতটা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলাম —কিন্তু ডান হাতের জায়গাটা ঠুঁটো, হাত নেই। এই ব্যতিক্রমটুকু ছাড়া লোকটার চেহারা ও চলাফেরা এত স্বাভাবিক ছিল যে, ওকে সহজেই স্যার ডোমিনিকের আর একজন ভারতীয় ভৃত্য বলে চালিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু লোকটার হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা বেশ রহস্যময়। মোমবাতি জ্বেলে ঘরের চারদিক খুঁজেও তার কোনও হদিস পেলাম না। বাকি রাতটুকু জেগে কাটিয়ে দিলাম। অবশ্য সেই রাতে আর কোনও ঘটনা ঘটেনি।

ভোর হতেই বাইরে বেরিয়ে দেখলাম। কাকা লনে পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই উত্তেজিতভাবে বললেন,— লোকটাকে দেখেছ? ভারতীয়। একটা হাত নেই।

—হ্যাঁ, দেখেছি।

—ব্রেকফাস্টের সময় এখনও হয়নি। এসো, তোমায় ততক্ষণে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। গত চারবছরে,— বোম্বেতে, দেশে ফেরার সময় জাহাজে, এই বাড়িতে—প্রতিটি রাত এই লোকটা আমার ঘুম ভাঙিয়েছে। ওর রুটিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারে স্থির। আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম ভাঙায়, তারপর আমার শোওয়ার ঘর থেকে ল্যাবরেটরিতে যায়, তাকে রাখা সবক'টা জার খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দ্যাখে, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়। এক হাজারেরও বেশিবার এই রুটিন দেখে-দেখে আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

—কী চায় লোকটা?

—ওর হাত ফেরত চায়।

—হাত?

—ব্যাপারটা তোমায় খুলে বলি। বছরদশেক আগে একবার আমাকে ডাক্তারি কাজে পেশোয়ার যেতে হয়েছিল। সেই সময় ঘটনাচক্রে এক রোগীকে আমার কাছে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। লোকটা আফগানিস্তানের প্রত্যন্তের কোনও উপজাতি সম্প্রদায়ের। ভাঙা-ভাঙা পোশতু-তে কথা বলছিল। ওর হাতের গাঁটে সাংঘাতিক একটা গ্যাংগ্রিন গোছের কিছু হয়েছিল। দেখেই বুঝলাম, ওই হাত কেটে বাদ না দিলে ওর বাঁচার কোনও আশা নেই। অনেক বোঝানোর পর ও অপারেশন করাতে রাজি হল। অপারেশনের পর ও আমার ফি জানতে চাইল। লোকটার আর্থিক অবস্থা প্রায় ভিখারির মতো। আমি হেসে ওকে বললাম যে, তোমার এই কেটে বাদ দেওয়া হাতটাই আমার ফি। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে আর একটা নুতন আইটেম আর কী!

কাকা বলে চললেন,—লোকটা আমার এই প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি জানাল। ওদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী মৃত্যুর পরে আত্মা আবার শরীরে প্রবেশ করে। সে ক্ষেত্রে মৃত মানুষের অঙ্গ হীনতা বা কোনও খুঁত আত্মার পক্ষে একটা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমি ওকে বললাম, তোমার তো হাতটা বাদ-ই গেছে। তা হলে ওটাকে কীভাবে রেখে দেবে? ও বলল, হাতটাকে নুনজলে চুবিয়ে আমার সঙ্গে নিয়েই ঘুরব। আমি তখন ওকে বোঝালাম যে হাতটা আমি আরও ভালোভাবে সংরক্ষণ করব। শেষ পর্যন্ত ও রাজি হয়ে গেল। কিন্তু বলল, সাহেব, আমি মারা যাওয়ার পরে কিন্তু ওই হাতটা আমার চাই। ব্যাপারটা আমি তখন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। তারপর বোম্বে ফিরে এসে আমি যথারীতি আমার প্রাইভেট প্র্যাকটিসে লেগে গেলাম। লোকটাও সম্ভবত ওর দেশে ফিরে যায়।

—আর ওই হাতটা?

—বলছি। তোমায় আগেই বলেছিলাম, বোম্বেতে আগুন লেগে আমার বাড়ির বহু জিনিস নষ্ট হয়। তার মধ্যে আমার সংগ্রহের বেশ কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও নষ্ট হয়ে যায়। ওই হাতটাও ছিল তারই মধ্যে। তখন অবশ্য সে ব্যাপার নিয়ে মাথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘামাইনি। এসব হয়েছিল ছ'বছর আগে। এরপরই শুরু হল আসল কাণ্ড। বছরচারেক আগে এক রাতে ঘুমের মধ্যে কে যেন আমার জামার হাতা ধরে টান মারল। প্রথমে ভাবলাম, আমার পোষা কুকুরটা। তারপরে দেখি, আলখাল্লা পরিহিত আমার সেই আফগান রোগী, ঠুঁটো বাহুটা তুলে আমায় দেখাচ্ছে। তারপরে ধীরে-ধীরে আমার ঘরে (তখনও আমার ল্যাবরেটরি ঘর মেরামত হয়নি) রাখা জারগুলো একে একে নিরীক্ষণ করে প্রথমে হতাশ, পরে ক্রুদ্ধ হয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, লোকটা সদ্যই মারা গেছে এবং আমার কাছে তার জমা রাখা হাতটা নিতে এসেছে!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাকা বললেন,—এরপর গত চারবছর ধরে প্রতিটি রাতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। রাতে এই ঘটনার জন্য অপেক্ষা করি বলে আমার ভালো ঘুম হয় না। তোমার কাকিমারও একই অবস্থা। আমাদের বার্ধকের শান্তিপূর্ণ জীবন এখন সম্পূর্ণভাবে বিষিয়ে গেছে। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তোমার সাহসের জন্যই আজ আমরা এই ব্যাপারটা কারওকে প্রথম জানালাম। তা ছাড়া, তুমিও যেহেতু ঘটনাটা নিজের চোখে দেখেছ, একটু স্বস্তি পাচ্ছি এই ভেবে যে আমি এখনও পাগল হয়ে যাইনি এবং ব্যাপারটা আমার স্বকপোলকল্পিত নয়।

নিজের চোখে সবকিছু দেখে এবং এই ধরনের বিষয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার যেটুকু জ্ঞান তা দিয়ে এটুকু বুঝতে পারলাম যে পুরো ব্যাপারটাই নির্ভেজাল সত্যি। ব্রেকফাস্টের পরে কাকা-কাকিমাকে বললাম যে আমায় এক্ষুনি একবার লন্ডনে যেতে হবে।

কাকা খানিকটা পরিতাপের সুরেই বললেন,—আমারই ভুল হয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্যের বোঝা তোমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে অন্যায় করেছি। তাই তুমি চলে যাচ্ছ।

—না, না, আমি এই রহস্যের সমাধানের জন্যই লন্ডনে যাচ্ছি। সন্ধেবেলায় ফিরে এসে রাতটা আজ ওই ল্যাবরেটরি ঘরেই কাটাব।

কাকাকে আর কিছু ভেঙে বললাম না। দুপুরে লন্ডনে পৌঁছে আমার চেম্বারে গিয়ে একটা বই খুলে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটায় চোখ বুলিয়ে নিলাম ঃ

'মৃত্যুর সময়ে বিশেষ কোনও মানসিক অবস্থার জন্য কিছু-কিছু আত্মা জড়জগত থেকে সঙ্গে-সঙ্গে মুক্তি পায় না। লোভ, প্রতিহিংসা, উদ্বেগ, প্রেম, করুণা ইত্যাদির জন্য এরকম মানসিক অবস্থা হতে পারে। সাধারণত এর কারণ কোনও অপূর্ণ কামনা। সেই কামনার পূরণের সঙ্গে-সঙ্গে আত্মা পৃথিবীর স্থূল পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে পারে। এমনকী কামনা পূরণের একটা মোটামুটি বিকল্পের ব্যবস্থা করতে পারলেও আত্মার মুক্তি সম্ভব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকাল থেকেই এই 'মোটামুটি বিকল্প' কথাগুলো আমার মাথায় আসছিল। বই থেকে এই অংশটা পড়ে নিশ্চিত হয়ে তক্ষুনি পৌঁছলাম শ্যাডওয়েলে নাবিকদের একটা হাসপাতালে যেখানে আমার বন্ধু জ্যাক হিউয়েট হাউস-সার্জন। ওকে খুঁটিনাটি না জানিয়ে খালি বললাম আমি কী চাই।

—কোনও ভারতীয় মানুষের একটা হাত! কেন? কী জন্যে চাই?

—তোমাকে পরে সবকিছু বলব। তোমাদের হাসপাতালে তো অনেক ভারতীয় রোগী আছে।

—দাঁড়ও, দেখি। বলে জ্যাক হাসপাতালের এক কম্পাউন্ডারকে ডেকে পাঠিয়ে জিগ্যেস করল,—আচ্ছা, জাহাজের মেশিনঘরে চাকায় ফেঁসে গিয়ে ওই যে জখম ভারতীয় নাবিকের হাত দুটো বাদ দেওয়া হল, সেই হাত দুটো এখন কোথায়?

—পোস্টমর্টেম-এর ঘরে আছে, স্যার।

—আচ্ছা, ওখান থেকে চট করে একটা হাত অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে প্যাক করে ডাঃ হার্ডএকরকে দিয়ে দাও।

রাতে কাকার বাড়িতে ফিরে ল্যাবরেটরি একটা খালি জারে হাতটা রাখলাম। জারটা যে তাকে রাখলাম, সেটা আমার বিছানার কাছাকাছি। কাকাকে বিশেষ কিছু খুলে বললাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ ঘুমের কোনও প্রশ্নই নেই। আমার পরীক্ষা সফল হয় কি না তা দেখার জন্য ঢাকনা দেওয়া একটা বাতি জ্বালিয়ে প্রতীক্ষা শুরু করলাম। এবার তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। প্রথমে দরজার কাছে একটা ছায়ার মতো দেখা গেল। তারপরে সেটা ধীরে-ধীরে একটা মানুষের অবয়বে পরিণত হল। কাল রাতের মতোই সে লাইন ধরে এক-এক করে জারগুলো দেখতে-দেখতে এসে থামল সেই জারের কাছে যাতে আমি লন্ডন থেকে আনা হাতটা রেখেছিলাম। আশায় অধীর হয়ে সে হাতটাকে জার থেকে বের করল, পরমুহূর্তের হতাশায় ও ক্রোধে কাঁপতে-কাঁপতে হাতটাকে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিল। সেই নিস্তব্ধ রাতে হাত ছুড়ে ফেলার আওয়াজ পুরো বাড়িতে শোনা গেল। তাকিয়ে দেখলাম, লোকটা আর নেই। স্যার ডোমিনিক দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে বললেন,—তোমার কোনও আঘাত লাগেনি তো?

—না-না। কিন্তু পরীক্ষা সফল হল না। খারাপ লাগছে।

ভাঙা কাচের মধ্যে পড়ে থাকা হাতটাকে দেখে কাকা বললেন,—প্ল্যানটা তুমি ভালোই করেছিলে। কিন্তু এ রহস্যের কোনও সহজ সমাধান নেই। তুমি কিন্তু আর কখনও এ ঘরে ঢুকবে না। তোমার কোনওরকম ক্ষতি হলে আমি নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারব না।

বাকি রাতটুকু ওই ঘরেই শুয়ে ভাবছিলাম আমার পরীক্ষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যর্থতার কথা। ভোরের আলো ঘরে এসে পড়তেই মেঝেতে পড়ে থাকা হাতটার দিকে তাকালাম। হাতটা তুলে একবার দেখতেই বিদ্যুৎচমকের মতো মাথায় একটা সমাধানের সূত্র এসে গেল। যা ভেবেছি, ঠিক তাই। আমার আনা হাতটা ওই আহত নাবিকের 'বাঁ-হাত'।

সকালের প্রথম ট্রেন ধরে লন্ডনে পৌঁছেই সোজা হাজির হলাম নাবিকদের সেই হাসপাতালেই। আমার আশঙ্কা তখন একটাই—পোস্টমর্টেম-এর পরে অন্য হাতটা যদি এতক্ষণে জ্বালিয়ে দিয়ে থাকে, তা হলে কী হবে! সৌভাগ্যবশত আমার আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হল—অন্য হাতটা এখনও পোস্টমর্টেম-এর ঘরেই রাখা আছে। সেটা নিয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে সন্ধের আগেই কাকার বাড়ি পৌঁছে গেলাম।

কাকা কিন্তু আমাকে কিছুতেই আর ল্যাবরেটরি ঘরে থাকতে দিলেন না। অগত্যা হাতটাকে একটা জারে ভরে আগের দিনের মতোই একটা তাকে রেখে দিলাম। তারপর শুতে গেলাম বাড়ির অন্য অংশে একটা ভালো শোওয়ার ঘরে।

কিন্তু আমার ভাগ্যে বোধহয় নিরুপদ্রব ঘুম আপাতত আর নেই। মাঝরাতে হাতে একটা বাতি নিয়ে ঢোলা ড্রেসিং গাউন পরা অবস্থায় উত্তেজিতভাবে যিনি ঘরে ঢুকলেন, তাঁকে দেখে গতকালের সেই আফগান লোকটাকে দেখার মতো ভয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেলে বা অবাক হলে কিছু অস্বাভাবিক হত না। কিন্তু ইনি স্যার ডোমিনিক—আমার কাকা। কোনও জাদুমন্ত্রবলে যেন তাঁর বয়স অন্তত কুড়ি বছর কমে গেছে। চোখেমুখে ঝকঝকে ভাব। বিজয়ীর ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে আমাকে বললেন,—হার্ডএকর, আমরা শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছি। এখন বলো, তোমার এই ঋণ আমি কী ভাবে শোধ করি?

—রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ। তাই তো তোমার ঘুম ভাঙিয়ে সুখবরটা দিতে এলাম। ভগবানই তোমাকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে বাঁচাতে—কেন না আর ছ'মাস এরকম চললে আমি আর বাঁচতাম না।

—কিন্তু কী দেখলেন? কী করে বুঝলেন যে সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে?

—যা দেখেছি বা অনুভব করেছি, তাতে আমি নিশ্চিত যে এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পরিসমাপ্তি হয়েছে। আজ রাতে সে আমার ঘরে এসে অন্যদিনের থেকেও জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে আমায় জাগিয়ে দিয়েছিল। কেন না গতকালের ঘটনায় সম্ভবত আমার প্রতি তার ক্রোধ ও বিদ্বেষ আরও বেড়ে গেছল। আমাকে জাগিয়ে সে তার চিরাচরিত ল্যাবরেটরি পরিক্রমায় চলে গেল। কিন্তু এত বছরে এই প্রথম সে আবার আমার ঘরে ফিরে এল। আনন্দে হাসছিল সে। কালো মুখে তার সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করছিল। তারপর আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিছানার পায়ের দিকে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের প্রথামতো তিনবার মাথা ঝুঁকিয়ে আমায় কুর্নিশ করল। তৃতীয়বার কুর্নিশ করার পর ও বাহু তুলতেই দেখলাম, ওর দুটো হাতই আছে। তারপরেই ও মিলিয়ে গেল এবং আশা করি, চিরদিনের জন্য।

এর পরে কাকাকে আর কখনও ওই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়নি। উনি আর কাকিমা আরও বেশ কিছুকাল বেঁচেছিলেন—সব মিলিয়ে শান্তিপূর্ণ দীর্ঘ জীবন। ইংল্যান্ডে জীবনযাপনের খুঁটিনাটি থেকে শুরু করে সম্পত্তি কেনাবেচা পর্যন্ত অনেক ব্যাপারেই ওঁরা আমার পরামর্শ নিতেন। সুতরাং আমার আর পাঁচ জ্ঞাতিভাইদের অগ্রাহ্য করে যখন স্যার ডোমিনিক আমাকে তাঁর প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে যান, তখন আমি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইনি। এক সাধারণ ডাক্তার থেকে রাতারাতি উইল্টশায়ারের এক বিখ্যাত ধনী ব্যক্তি হিসেবে আমি পরিচিত হলাম। এর জন্য কিন্তু হাতকাটা ওই আফগান লোকটি এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাকার বাড়িতে আসার প্রথম দিনটির কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

'The Brown Hand' গল্পটির অনুবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিশোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচ্ছা, বার্গার, তুমি কেন আমাকে বিশ্বাস করে সবকিছু খুলে বলছ না?

কথা হচ্ছিল দুই বন্ধুর মধ্যে—একজনের নাম কেনেডি, অন্যজন বার্গার। শীতের সন্ধ্যায় রোম শহরে কেনেডির বসার ঘরে। বাইরে আলোয় ঝলমলে আধুনিক রোম। জনবহুল রাস্তা, গাড়িঘোড়া চলছে, হোটেল-রেস্তোরাঁয় আলোর বাহার। কিন্তু কেনেডির ঘরে প্রাচীন রোমের বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্নের সমারোহ। কেনেডির আসল বাড়ি ব্রিটেনে—পেশায় ও নেশায় পুরাতত্ত্ববিদ। ঘরের একটি দেওয়ালে ঝুলছে প্রাচীন রোমের একটি দেওয়ালচিত্রের অংশবিশেষ। এদিক-ওদিকে রাখা পুরোনো আমলের কিছু আবক্ষ মূর্তি—রোমান সেনেটর ও যোদ্ধাদের। ঘরের সেন্টার টেবিলের ওপর পুরোনো রোমের জন-স্নানাগারের একটা ছোট সংস্করণ রাখা আছে। এ ছাড়া ঘরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো পুরোনো রোমের টুকিটাকি স্মৃতিচিহ্ন—শিলালিপির টুকরো, গয়না, বাসনপত্র ইত্যাদি। সবই প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের সময়ে উদ্ধার করা। এমনকী সিলিং-এ ঝোলানো একটা অতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাচীন ফুলদানি। প্রতিটি জিনিসই প্রামাণ্য এবং দুর্লভ। অর্থ দিয়ে এগুলির দাম নিরুপণ করা যায় না।

কেনেডির বয়স ত্রিশের সামান্য বেশি, কিন্তু এই অল্পবয়সেই পুরোনো রোমের ওপর পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় তার নাম সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে। ধনী পরিবারের সন্তান হিসেবে আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য কেনেডি মাঝে-মাঝে একটু আধটু পয়সা উড়িয়ে ফুর্তি করলেও তার বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ এবং প্রত্নতত্ত্বের প্রতি ভালোবাসা এত তীব্র যে, সে দীর্ঘসময় নিবিষ্টচিত্তে গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকে। কেনেডি বেশ সুপুরুষ—কপাল চওড়া, নাকটি তীক্ষ্ণ। মুখে যুগপৎ দৃঢ়তা ও দুর্বলতার ছাপ।

কেনেডির বন্ধু জুলিয়স বার্গার কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মানুষ। বার্গারের বাবা জার্মান, মা ইটালিয়ান। জার্মানির শারীরিক শক্তি ও কঠোরতার সঙ্গে ইটালির কমনীয়তা—এই বৈপরীত্যের সমাবেশ বার্গারের ব্যক্তিত্বে। তার চেহারায় প্রথমেই চোখে পড়ে তার নীল চোখ, বিশাল কপাল ও সোনালি চুল। সেই সঙ্গে নজরে পড়ে তার রোদে জ্বলা গায়ের রং। সব মিলিয়ে বার্গারকে দেখলে পুরোনো রোমের আবক্ষ মূর্তিগুলির মুখাবয়ব মনে পড়ে যায়। বার্গারের সরল হাসি আর স্বচ্ছ দৃষ্টি অবশ্যই ওর বংশপরিচয়ের ইঙ্গিতবাহী। বয়স ও খ্যাতিতে বার্গার কেনেডির সমকক্ষ, কিন্তু লক্ষণীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃপা না পাওয়ায় তাকে অনেক কষ্ট করে ওপরে উঠতে হয়েছে। বারো বছর আগে জার্মানির বনবিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য একটা বৃত্তি নিয়ে ও রোমে এসেছিল। তারপর এত বছর ধরে অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করে ধীরে-ধীরে পুরাতত্ত্বে খ্যাতিলাভ করে ও আজ বার্লিন আকাদেমির একজন সদস্য। কিন্তু পুরাতত্ত্বের বাইরে অন্য সমস্ত ব্যাপারে, বিশেষ সামাজিক আদবকায়দায়, বার্গার ধনী কেনেডির থেকে অনেক নীচে। নিজের পড়াশোনার বিষয়ে কথা বলতে গেলে ওর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, কিন্তু বাকি সব ব্যাপারেই বার্গার চুপচাপ ও মুখচোরা গোছের।

চারিত্রিক বৈপরীত্য সত্ত্বেও গত কয়েক বছরে এদের দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব ক্রমশ গাঢ় হয়েছে। দু'জনেই পরস্পরের পেশাগত দক্ষতার ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল। বার্গারের সহজ সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হত কেনেডি। আবার কেনেডির প্রাণপ্রাচুর্য, উচ্ছলতা ও রোমের হাই-সোসাইটিতে ওর অবাধ বিচরণ বার্গারের ভালো লাগত। আপাতত একটা কারণে দু'জনের সম্পর্কের ওপর একটু কালো ছায়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তার কারণ একটা গুজব—কেনেডি নাকি একটি মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন ব্যবহার করেছে। রোমের অনেকেই খানিকটা কৌতূহলবশত এবং খানিকটা ঈর্ষার জন্য এই ঘটনাটি নিয়ে কানাঘুষো করছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আচ্ছা বার্গার! তুমি কেন আমাকে বিশ্বাস করে সবকিছু খুলে বলছ না? বার্গারের শান্ত মুখের দিকে চোখ রেখে ও মেঝের কার্পেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে কেনেডি আবার একই কথা বলল। কার্পেটের একধারে একটা লম্বামতো বেতের ঝুড়ি রয়েছে। তাতে নানা জিনিস। যেমন টালির টুকরো, শিলালিপির ভগ্নাবশেষ, মরচে-ধরা পুরোনো গয়না, ছেঁড়া প্রাচীন কাগজ ইত্যাদি। জিনিসগুলি দেখলে প্রথমেই মনে হবে এগুলি কোনও ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে আনা। কিন্তু পুরাতাত্ত্বিকের চোখে এগুলি অতি দুর্লভ মহার্ঘ বস্তু। জিনিসগুলি কেনেডির ঘরে এনেছে বার্গার।

লোভে চকচক করছিল কেনেডির চোখ। ও আবার বলল,—তোমার এই অমূল্য রত্নভাণ্ডারে আমি ভাগ বসাচ্ছি না। কিন্তু তোমার এই আবিষ্কার একেবারে প্রথম সারির। পুরো ইউরোপে সাড়া পড়ে যাবে। কিন্তু কোথায় পেলে এসব আমায় বলবে না?

একটা চুরুট ধরিয়ে বার্গার বলল,—এখানে যা দেখছ, তা কিছুই নয়। আমার আবিষ্কৃত জায়গায় বারো জন পুরাতাত্ত্বিক এই ধরনের জিনিসের মধ্যে অনায়াসে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে।

কেনেডি কপাল কুঁচকে গোঁফে হাত বুলোতে-বুলোতে বলল,—বার্গার, তুমি না বললেও আমি বুঝতে পেরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছি। তুমি নিশ্চয়ই ভূগর্ভে কোনও একটা বড় কবরখানা আবিষ্কার করেছ। এত ধরনের পুরোনো জিনিস কবরখানা ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যাবে?

—ঠিকই বলেছ। আমি ভূগর্ভে একটা নতুন কবরখানার খোঁজ পেয়েছি।

—কোথায়?

—সেটা কী করে বলি কেনেডি? এটুকু বলতে পারি আমি না দেখিয়ে দিলে জায়গাটা কারও পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এই কবরখানাটা ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকের জন্য। সুতরাং এখানে যে ধরনের ভগ্নাবশেষ ও স্মৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে আছে তা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। আমি প্রথমে এটার ওপর গবেষণা করে একটা পেপার লিখব, তারপরে তোমার মতো প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে সমস্ত কিছু খুলে বলব।

পুরাতত্ত্বের প্রতি কেনেডির ভালোবাসা অসীম। এই নতুন আবিষ্কারের ব্যাপারে জানার জন্য সে প্রায় অধৈর্য হয়ে বার্গারকে বলল,—বার্গার, আমি তোমায় শপথ করে বলছি, তোমার অনুমতি ছাড়া এ বিষয়ে আমি কোনও পেপার লিখব না। অতএব তুমি নির্দ্বিধায় আমাকে তোমার আবিষ্কারের ব্যাপারটা খুলে বলতে পারো। নাহলে কিন্তু আমি নিজে চেষ্টা করে জায়গাটা খুঁজে বের করব। আর এই ব্যাপারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার আগেই আমার গবেষণাপত্র প্রকাশ করব।

চুরুটে টান দিয়ে হালকা হেসে বার্গার বলল,—দ্যাখো ভাই, তুমি কিন্তু তোমার কোনও কথাই আমাকে কখনও খুলে বলো না। আজ পর্যন্ত তোমার একান্ত গোপনীয় কিছু আমায় খুলে বলেছ কি?

—তুমি কি বলতে চাইছ ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে তোমার যে-কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি রাজি আছি।

সোফায় ভালো করে হেলান দিয়ে চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বার্গার বলল,—বেশ। এবার বলো, মেরি সন্ডারসনের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক ছিল।

প্রচণ্ড রেগে গিয়ে কেনেডি চেঁচিয়ে উঠল,—এটা কী ধরনের প্রশ্ন? তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?

বার্গার স্বাভাবিকভাবে বলল,—না বন্ধু, এটা ঠাট্টা নয়। আমি তোমাকে চিনি আর ওই মেরি নামের মেয়েটিকেও দেখেছি। তাই তোমার মুখ থেকে জানতে চাই, তোমাদের দুজনের মধ্যে ঠিক কী হয়েছিল।

—আমি তোমাকে একটি কথাও বলব না।

—তা হলে তো ব্যাপারটা মিটেই গেল। রাত দশটা বাজল, এবার চলি।

কেনেডি ব্যাকুলভাবে বলে উঠল,—না, না বার্গার, একটু অপেক্ষা করো। এখনই যেও না। যে ব্যাপারটা নিয়ে জানতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাইছ, সেটাতো বেশ পুরোনো হয়ে গেছে। এখন সে সম্বন্ধে কিছু জানতে চাওয়া প্রায় পাগলামির পর্যায়ে পড়ে।

বার্গার উঠে দাঁড়িয়ে তার বেতের ঝুড়িটা হাতে নিয়ে বলল,—ঘটনাটা শুধু তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এ নিয়ে পুরো রোমে অনেক আলোচনা হয়েছিল। যা হোক, শুভরাত্রি।

প্রায় দরজার কাছ থেকে বার্গারের হাত ধরে ওকে ভেতরে এনে কেনেডি বলল,—বলো, কী জানতে চাও?

একটা চুরুট ধরিয়ে আবার বসে পড়ে বার্গার জিগ্যেস করল,—মেরি সন্ডারসনের শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল?

—ও তো দেশে নিজের বাড়িতে ফিরে গেছে। ইংল্যান্ডে।

—কিন্তু ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত না? তোমার সঙ্গে বেশ কিছুকাল মেরির বন্ধুত্ব ছিল। তা হলে ও হঠাৎ এমন করে চলে গেল কেন? আর তোমার সঙ্গে যদি ওর বন্ধুত্ব না হয়ে থাকে, তা হলে ওকে আর তোমাকে জড়িয়ে এত গুজব কেন?

কেনেডি ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকিয়ে খানিকটা অন্যমনস্কভাবে বলল,—হয়তো তুমি ঠিকই বলছ। মেরিকে আমি বেশ পছন্দই করতাম। কিন্তু এখন বুঝি, ব্যাপারটা তার বেশি কিছুই নয়। আসলে ওর সঙ্গে বন্ধুত্বটা করেছিলাম খানিকটা অ্যাডভেঞ্চার-এর নেশায়। মেরি তো একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিজাত ঘরের মহিলার সঙ্গিনী ছিল। ওর সঙ্গে নাকি একজনের বিয়েও ঠিক হয়ে গেছল। এতসব বাধা সত্ত্বেও ওর সঙ্গে যোগাযোগ করা আর বন্ধুত্ব পাতানো একটা অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে দেখেছিলাম।

—কিন্তু মেয়েটির হবু স্বামীর কী হল?

—কে জানে কী হয়েছে। লোকটা নিশ্চয়ই আমার তুলনায় অত্যন্ত সাধারণ মানের ছিল।

—আর একটা প্রশ্ন। এত তাড়াতাড়ি তুমি কীভাবে মেয়েটিকে বিদায় করলে?

—আমাদের ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার পর মেয়েটি আর রোমে থাকতে চাইল না। এদিকে আমার পক্ষে রোম ছাড়া অসম্ভব। তা ছাড়া, ওর বাবাও খুব রাগারাগি করছিলেন। তাই আমি ধীরে-ধীরে নিজেকে এই সম্পর্কের থেকে সরিয়ে নিলাম। আর আমার কিছু বলার নেই।

—ভাই কেনেডি, আমি পুরো ব্যাপারটা অবশ্যই গোপন রাখব। তবে একটা কথা বলি। তোমার আর আমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। এবার বলো, আমার আবিষ্কার করা জায়গায় কবে যেতে চাও?...চলো না, আজ রাতেই যাওয়া যাক। একটু শীত হলেও আজকের রাতটা ভারী সুন্দর।

—জায়গাটা কত দূরে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—বেশি দূরে নয়। হেঁটে গেলেই ভালো। এত রাতে গাড়ি ভাড়া করলে গাড়িওয়ালা সন্দেহ করবে। আমি বরং আমার বাড়ি থেকে মোমবাতি, দেশলাই ও আর কয়েকটা দরকারি জিনিস নিয়ে শহরের বড় গেটটার কাছে ঠিক রাত বারোটার সময় তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

—ঠিক আছে। আমিও পৌঁছে যাব।

শহরের ঘড়িঘর-এ যখন রাত বারোটার ঘণ্টা বাজছে, ঠিক তখনই হাতে একটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে ওভারকোট পরা বার্গার নির্দিষ্ট স্থানে এসে হাজির হল। একটু দূরেই অপেক্ষারত কেনেডি এগিয়ে এল বার্গারের কাছে।

রাতের হাওয়া বেশ ঠান্ডা। শরীর গরম রাখতে দু'জনেই পাথুরে রাস্তার ওপর দিয়ে দ্রুত চলতে লাগল। রাস্তায় দু-একজন বিক্ষিপ্ত পথচারী ছাড়া আর জনমানুষের চিহ্ন নেই। রাস্তার দু'ধারে কবরখানা ও অনেক স্মৃতিসৌধ। বেশ খানিকটা গিয়ে সেন্ট ক্যালিকস্টাসের সমাধির কাছে বার্গার থামল।

বার্গার বলল,—দাঁড়াও। এর খুব কাছেই আমার আবিষ্কৃত সমাধি। এই যে এদিকে এসো। এই সরু রাস্তাটা দিয়ে যেতে হবে। তুমি আমার পেছনে এসো।

কাঠের তৈরি একটা ফাঁকা গোয়ালঘরের কাছে গিয়ে বার্গার পকেট থেকে চাবি বের করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেনেডি বলল,—একী! তোমার ভূগর্ভের ভাণ্ডার এই বাড়ির মধ্যে না কি?

—হ্যাঁ, এটাই রাস্তা। এই ঘরটির জন্য লোকে ভাবতেই পারবে না যে এর নীচে কী আছে। এমনকী এই বাড়ির মালিকও জানে না যে তার বাড়ির নীচে আছে পুরাতত্ত্বিক রত্ন ভাণ্ডার। এই বাড়িটা আমি ভাড়া নিয়েছি। ভেতরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দাও।

যদিও বাড়িটা জনহীন, বার্গার তবুও লণ্ঠনের বেশির ভাগটাই ওভারকোট দিয়ে ঢেকে রাখল, যাতে বাইরে থেকেও কেউ তাদের উপস্থিতি টের না পায়। ঘরে এক কোণে কাঠের মেঝেটা ঢিলে ছিল। দুজনে মিলে সেখান থেকে কয়েকটা তক্তা তুলে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে রাখল। মেঝের ফোকরটা থেকে নীচে পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে। বার্গার আগে হাতে আলো নিয়ে নামল—পেছনে কেনেডি। নীচে নেমে মনে হল এটা যেন বুনো খরগোশের গর্ত—অর্থাৎ অজস্র অলিগলিতে ভরা। একবার রাস্তা হারিয়ে ফেললে সঠিক রাস্তা খুঁজে বাইরে বেরিয়ে আসা অসম্ভব বললেই হয়।

কেনেডি বলল,—তুমি কী করে এই গোলকধাঁধায় চলাফেরা করো?

—প্রথমদিকে আমিও দু-একবার প্রায় ফেঁসে গেছলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন গলি-ঘুঁজির প্ল্যান একটু আধটু বুঝতে পারি। তা সত্ত্বেও এখনও বেশি ভেতরে যেতে গেলে সুতোর গোলা সঙ্গে নিয়ে সুতো ছাড়তে-ছাড়তে যাই।

প্রায় বিশ ফুট্ নীচে একটা চৌকো মতো জায়গায় ওরা দু'জনে দাঁড়িয়ে। লণ্ঠনের কাঁপা আলোয় হলদেটে ফাটা দেওয়াল চোখে পড়ছে। আর এই চৌকোনা জায়গাতে চারদিক থেকে বেরিয়েছে অজস্র সুড়ঙ্গের মতো গলি—গলির মুখগুলো ঘুটঘুটে অন্ধকার।

বার্গার কেনেডিকে বলল,—তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে-সঙ্গে এসো। অন্য কোনওদিকে যাওয়ার চেষ্টা কোরো না। তোমাকে সোজা নিয়ে যাচ্ছি দুর্লভ জিনিসের জায়গাটায়।

মাঝে-মাঝেই এক-একটা গলি দুভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। বার্গার নির্দ্বিধায় এগিয়ে চলল। মনে হয় যাওয়ার পথে ও কোনও গোপন চিহ্ন রেখে দিয়েছে। চতুর্দিকে দেওয়ালের ধারে-ধারে মমি-তে পরিণত মৃতদেহ থাকে-থাকে রাখা। আধো-আলো আধো-আঁধারে কঙ্কালসার মমিগুলো দেখে গা ছমছম করছিল কেনেডির। কিন্তু তবুও ও উৎসুকভাবে দেখছিল মৃতদেহগুলির চারপাশে ছড়িয়ে রাখা শিলালিপি, বাসনপত্র, গয়না ও অন্য টুকিটাকি জিনিস। কেনেডি বুঝতে পারছিল যে ভূগর্ভের আবিষ্কৃত সমাধিগুলির মধ্যে এই সমাধিটি অতি প্রাচীন এবং পুরোনো রোমে আদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ্রিস্টানদের একটা উল্লেখযোগ্য কবরখানা।

হঠাৎ কেনেডি জিগ্যেস করল,—আচ্ছা, লণ্ঠনের আলো নিভে গেলে কী হবে?

—আমার কাছে মোমবাতি আর দেশলাই আছে। তোমার কাছে দেশলাই আছে কি?

কেনেডি উত্তর দিল,—না। তুমি বরং আমায় ক'টা দেশলাই দাও।

—না, তার কোনও দরকার নেই। আমাদের দু'জনের ছাড়াছাড়ি হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

—আচ্ছা, বার্গার, আর কত দূরে যেতে হবে? প্রায় সিকি মাইল তো হাঁটা হয়ে গেল।

—সিকি মাইলেরও বেশি। আসলে এই বিস্তীর্ণ সমাধিক্ষেত্রের কোথায় যে শেষ, তা আমিও জানি না। দাঁড়াও, আমার সুতোর গোলাটা বের করি। বাকি পথটায় হাঁটা আরও কঠিন।

সুতোর একপ্রান্ত একটা পাথরের কোণায় বেঁধে সুতোর গোলাটা বুক পকেটে নিয়ে বার্গার চলতে লাগল। কেনেডি বুঝতে পারছিল যে গলিগুলো এখন গোলকধাঁধার মতো জটিল হয়ে উঠেছে। খানিকক্ষণ পরে ওরা একটা বড় গোলাকার হলঘরে পৌঁছে গেল। ঘরের মাঝখানে চৌকো এক বেদির ওপর একটা শ্বেতপাথরের ফলক রাখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লণ্ঠনের আলোয় ফলকটা দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে কেনেডি বলল,—এ তো দারুণ জিনিস! খ্রিস্টানদের বানানো প্রথম বেদি হয়তো এটাই। নিশ্চয়ই এই ঘরটাকে চার্চ হিসেবে ব্যবহার করা হত।

বার্গার বলল,—ঠিক বলেছ। এই ঘরের দেওয়ালের ফাঁকে-ফাঁকে যে দেহগুলো মমি করে রাখা আছে, সেগুলো সবই সেই সময়ের বিশপ ও পোপদের। তুমি অন্তত একটা দেহ কাছে গিয়ে দেখে এসো।

কেনেডি দেওয়ালের দিকে গিয়ে একটা মৃতদেহের মাথার দিকে তাকিয়ে বলল,—আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, তোমার এই আবিষ্কার সত্যিই অভূতপূর্ব। লণ্ঠনটা একটু কাছে নিয়ে এসো—আমি এগুলো সব দেখতে চাই।

ততক্ষণে বার্গার একটু দূরে সরে গেছে এবং হলঘরের অন্যদিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ ও কেনেডিকে বলল,—এইখান থেকে বাইরে বেরোনোর সিঁড়ি অবধি যাওয়ার পথে কতগুলো ভুল রাস্তা আছে জানো? দু'হাজারের ওপর। প্রাচীন খ্রিস্টান সম্প্রদায় এইরকম গোলকধাঁধা বানিয়ে নিজেদের সমাধিক্ষেত্র রক্ষা করত। সঙ্গে আলো থাকলেও এখান থেকে বেরোনো কঠিন। আর অন্ধকার হলে তো কথাই নেই।

—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আর এই অন্ধকার ভয়াবহ। একবার এই অন্ধকারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের চেষ্টা করেছিলাম। আজ আবার একবার চেষ্টা করি।

এই বলেই বার্গার লণ্ঠনের দিকে ঝুঁকল আর পর মুহূর্তেই সবকিছু নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢেকে গেল। যেন একটা অদৃশ্য হাত কেনেডির দু'চোখ চেপে ধরে আছে। এই অন্ধকারের যেন একটা শরীরী সত্তা আছে যা কেনেডিকে পিষে ফেলতে চাইছে। এই অন্ধকার যেন একটা নিরেট দেওয়াল, যার কাছে যেতে শরীর ভয়ে কেঁপে ওঠে।

—অনেক হয়েছে বার্গার। এবার আলোটা জ্বালো।

বার্গার তখন হাসতে আরম্ভ করল ও সেই হাসির গা ছমছমে প্রতিধ্বনি ঘরের চারদিক থেকে শোনা যেতে লাগল। বার্গার বলল,—কী হল কেনেডি, ঘাবড়ে গেলে না কি?

—আর দেরি কোরো না—এবার আলোটা জ্বালাও। কেনেডির গলায় ব্যাকুলতা।

—জানো কেনেডি, তোমার কথা শুনে বুঝতেই পারছি না, যে তুমি কোনখানে দাঁড়িয়ে। তুমি কি বুঝতে পারছ আমি কোথায়।

—না। মনে হচ্ছে তুমি আমার চারদিকেই দাঁড়িয়ে আছ।

—এই সুতোটা আমার হাতে না থাকলে বুঝতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারতাম না যে কোন রাস্তা ধরব।

—তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বালাও। শেষ করো এই তামাশা।

—কেনেডি, তুমি দুটো জিনিস খুব পছন্দ করো। এক হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার আর দু'নম্বর হল যে-কোনও বাধা অতিক্রম করা। এই গোলকধাঁধা থেকে বেরোনো হবে আসল অ্যাডভেঞ্চার। আর বাধাগুলো হচ্ছে, এই অন্ধকার আর দু'হাজার ভুল রাস্তা। ঠিক জায়গায় পৌঁছোতে একটু অসুবিধে হবে অবশ্যই। কিন্তু তোমার হাতে এখন প্রচুর সময়—তাড়াহুড়ো করার কোনও দরকার নেই। মাঝে-মাঝে যখন বিশ্রামের জন্য একটু থামবে তখন একটু মেরি সান্ডারসনের কথা ভেব। আর এটাও ভেবে দেখো, তুমি ওর সঙ্গে যথাযথ ব্যবহার করেছিলে কি না।

—শয়তান! তুমি কী বোঝাতে চাইছ? বিকৃত গলায় চিৎকার করে কেনেডি সেই ঘরে ছোট-ছোট বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল আর যেন সেই ঘন অন্ধকারকে দু'হাত দিয়ে ধরতে চাইল।

একটু দূর থেকে বিদ্রূপের সুরে কথা ভেসে এল,—বিদায় কেনেডি। তুমি এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে তুমি মেরির প্রতি অন্যায় করেছ। খালি একটা ছোট ব্যাপার তোমাকে বলা হয়নি। মেরির বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল একটা গরিব, সামাজিক আদবকায়দা না-জানা লোকের সঙ্গে আর সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটার নাম জুলিয়াস বার্গার।

জামাকাপড়ের একটা খসখসে আওয়াজ শোনা গেল। আর শোনা গেল পাথরের ওপর আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যাওয়া পায়ের আওয়াজ। তারপরেই ভূগর্ভের সেই পুরোনো চার্চে নেমে এল এক নিশ্ছিদ্র নিস্তব্ধতা। জলে ডুবে গেলে মানুষকে যেমন জল ঘিরে ধরে, সেই নিস্তব্ধতাও কেনেডিকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরল।

দু'মাস পরে ইউরোপের খবরের কাগজে নিম্নলিখিত সংবাদটি বেরিয়েছিল ঃ

রোমে সদ্য আবিষ্কৃত ভূগর্ভের একটি সমাধিক্ষেত্রকে পুরাতত্ত্বের জগতে একটা আবিষ্কার বলা যেতে পারে। জার্মানির তরুণ পুরাতত্ত্ববিদ জুলিয়াস বার্গার এই সমাধিক্ষেত্রটি আবিষ্কার করেন। প্রাচীন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্নে ভরা এই সমাধিক্ষেত্র পুরাতত্ত্বের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। যদিও এই আবিষ্কারের ওপর গবেষণাপত্রটি বার্গারের লেখা, তবে মনে হয় আর এক কম ভাগ্যবান পুরাতাত্ত্বিক এই জায়গাটি বার্গারের আগেই আবিষ্কার করেছিলেন। মাস দুই আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণ ব্রিটিশ পুরাতাত্ত্বিক কেনেডি হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান। অনেকে ভেবেছিলেন, একটি মেয়েকে জড়িয়ে একটা কলঙ্কজনক ব্যাপারে তাঁর নাম এসে যাওয়ায় তিনি রোম ছেড়ে চলে গেছেন। এখন বোঝা যাচ্ছে পুরাতত্ত্বের প্রতি ভালোবাসাই তাঁকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। কেনেডির মৃতদেহ সম্প্রতি ওই সমাধিক্ষেত্রেই পাওয়া গেছে। মৃতদেহের পা আর জুতোর অবস্থা দেখে মনে হয়, কেনেডি দিনের পর দিন ওই ভূগর্ভের গোলোকধাঁধাঁয় পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এমনকী মোমবাতি বা দেশলাই পর্যন্ত সঙ্গে না নিয়ে ওই ভূগর্ভে ঢুকে তিনি চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন। ব্যাপারটা আরও বেদনাদায়ক এই কারণে যে কেনেডি ছিলেন ডাঃ জুলিয়াস বার্গারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কেনেডিকে হারানোর বেদনা ডাঃ বার্গারের আবিষ্কারের আনন্দকে অনেকটাই ম্লান করে দিয়েছে।

'The New catacomb' গল্পের অনুবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুষ্টিযুদ্ধ

১৩৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালটা সম্ভবত ১৮৭৮। ইংল্যান্ডে লুটন শহরের কাছে ইংরেজ সেনাদলের একটা পল্টনের শিবির। কিন্তু সম্ভাব্য ইউরোপীয় যুদ্ধের ব্যাপারে পল্টনের সৈন্যদের বিশেষ কোনও ভাবনা চিন্তা নেই। ভাবনা তাদের একটাই—সার্জেন্ট বার্টনকে কীভাবে মুষ্টিযুদ্ধে হারানো যায়। হাড়ে মাসে দু-শো পাউন্ড ওজনের শক্তপোক্ত চোহারা বার্টনের। দু-হাতেই ঘুষির এত জোর যে দলের আর কেউ তার সঙ্গে বক্সিং লড়তে গেলে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কুপোকাত হয়। সবাইয়ের অভিমত—বার্টনকে বক্সিং-এ একবার অন্তত হারাতে না পারলে ওর ঔদ্ধত্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। অতএব দলের সিনিয়র অফিসার ফ্রেড মিলবার্নের ওপর ভার পড়ল লন্ডনে গিয়ে একজন ভালো বক্সারকে জোগাড় করে তার সঙ্গে বার্টনের একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

ইংল্যান্ডে বক্সিং-এর ইতিহাসে সেই সময়টা একটা সন্ধিক্ষণ। আগেকার দিনের খালি হাতে লড়ার ট্র্যাডিশন শেষ হয়ে এসেছে। অন্যদিকে দস্তানা পরে, স্টেডিয়ামের রিং-এর মধ্যে নিয়মকানুন মেনে বক্সিং-এর যে আধুনিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথা, তা তখনও শুরু হয়নি। ফলে যে সময়ের কথা আমরা বলছি, সেই সময়ে বক্সিং সমাজের সবথেকে নিম্নস্তরের লোকদের খেলায় পরিণত হয়েছে। যত্র তত্র, অর্থাৎ খামারবাড়িতে, আস্তাবলে, যে-কোনও নির্জন জায়গায় বক্সিং লড়া হত। কোনও নিয়মকানুনের কেউ ধার ধারত না। খেলাটা চলে গেছল কিন্তু গুন্ডাপ্রকৃতির লোকের হাতে, যাদের একমাত্র লক্ষ ছিল বাজি রেখে খেলা ও কিছু টাকা কামিয়ে নেওয়া। মুষ্টিযুদ্ধে কুশলতা না থাকলেও কিছু লোক চোখ রাঙিয়ে, চেঁচামেচি করে নিজেদের দক্ষ বক্সার বলে চালিয়ে দিত।

এইরকম পরিস্থিতিতে বক্সিং-এর আখড়া ও খেলাধূলার ক্লাবে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করেও মিলবার্ন তেমন কোনও ভালো বক্সারের খোঁজ পেলেন না। হেভিওয়েট দু-একজনকে পাওয়া গেলেও তাদের চাহিদা অত্যন্ত বেশি। শেষে অ্যালফ স্টিভেন্স নামের একজন মিড্‌লওয়েট বক্সারের খোঁজ পেলেন মিলবার্ন।

অ্যালফকে সবাই এক ডাকে চ্যাম্পিয়ন বলে চেনে। ও নাকি এখনও পর্যন্ত কোনও লড়াইতেই হারেনি। সার্জেন্ট বার্টনের থেকে ওজনে কম হলেও অ্যালফ সেটা পুষিয়ে নিতে পারবে তার অভিজ্ঞতা ও শরীরিক কুশলতা দিয়ে। এইসব ভেবে মিলবার্ন অ্যালফের সঙ্গেই কথা পাকা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিলেন এবং একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে দুজনে লুটন রওনা হলেন। প্ল্যানটা হল, রাতটা একটা সরাইখানায় কাটিয়ে পরের দিন শিবিরে পৌঁছে যাওয়া।

ট্রাফালগার স্কোয়ার হয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রিট পেরিয়ে যাওয়ার পর আস্তে-আস্তে লন্ডনের জনবহুল অঞ্চল শেষ হয়ে গেল। রাস্তা একটু ফাঁকা, হতেই মিলবার্ন গাড়িটা একটু জোরে চালাতে লাগলেন। তাঁর পাশে বসে অ্যালফ। আর সহিস বেট্‌স গাড়ির পেছন দিকে। অ্যালফকে এই প্রথম খুঁটিয়ে দেখে খুশি হলেন মিলবার্ন। শরীরে একটুও মেদ নেই। মুখ-চোখ দেখে বোঝা যায়, অসম্ভব সাহসী এবং প্রকৃত লড়িয়ে। মনে হয় এতদিনে ওই গোঁয়ার সার্জেন্ট বার্টনকে শায়েস্তা করা যাবে।

—তুমি কি নিয়মিত ট্রেনিং করো? মিলবার্ন জিগ্যেস করলেন।

—হাঁ স্যর। সবসময় ফিট থাকার চেষ্টা করি। এই তো গত সপ্তাহেই একটা বড় লড়াইতে জিতেছি।

—বেশ! এবার কিন্তু তোমাকে যার সঙ্গে লড়তে হবে, তার ওজন ও উচ্চতা তোমার থেকে অনেক বেশি।

অ্যালফ একটু হেসে বলল,—অনেক হেভিওয়েটকেই হারিয়েছি আমি। এটুকু বলতে পারি আমার চেষ্টার কোনও ত্রুটি থাকবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ মিলবার্ন বললেন,—জানো, এই অঞ্চলেই এই রাস্তায় একটা গুন্ডাপ্রকৃতির বক্সার থাকে বলে শুনেছি। কেউ-কেউ লোকটাকে দেখেছে, আবার কেউ-কেউ বলে লোকটা নাকি কাল্পনিক। লোকটার একটা সাথীও আছে। পূর্ণিমার রাতে নাকি ওরা দুজনে এই রাস্তায় চলে আসে আর কোনও পথচারীকে পেলে তার সঙ্গে লড়াই করার জন্যে চ্যালেঞ্জ জানায়। একজন ঘুষি মারতে থাকে, অন্যজন মাটিতে পড়ে যাওয়া প্রতিপক্ষকে আবার দাঁড় করায়। এমন অনেক পথিককে এই রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে, যাঁদের মুখ রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত। ভাবছিলাম আজ হঠাৎ যদি আমাদের সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে যায়—!

—স্যর, তাহলে কিন্তু খুব ভালো হয়। আমার খুব ইচ্ছে করে পুরোনো দিনের স্টাইলে খালি হাতে লড়াই করতে। অ্যালফ বলল।

—তোমার একটুও ভয় লাগবে না?

—ভয়! কী বলছেন! দশ মাইল দূরে গিয়েও ওদের সঙ্গে লড়তে রাজি আছি। খালি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না—ওরা যদি এতই ভালো বক্সার তাহলে ওদের নাম শোনা যায় না কেন?

—কী জানি! হয়তো ওরা এদিকেই কোথাও ঘোড়া-টোড়ার দেখাশোনা করে—বাইরে যায় না। তাই বিশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ ওদের চেনে না। তবে ব্যাপারটা একটু রহস্যময়ই। আরে! আরে! এ কী!

হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠলেন মিলবার্ন। এই জায়গায় রাস্তাটা বেশ ঢালু হয়ে গেছে আর দুধারে বড় গাছের সারি এমনভাবে আছে যে, মনে হয় গাড়িটা যেন একটা টানেলে ঢুকছে। রাস্তার ঢালু অংশটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখানে পাথরের পুরোনো ভগ্নপ্রায় ও শ্যাওলাধরা দুটো স্তম্ভ। স্তম্ভের পরেই একটা জংধরা লোহার গেট এবং তার পরেই একটা পুরোনো পরিত্যক্ত প্রাসাদ। এই গেটের কাছেই প্রায় ছায়ার মধ্যে থেকে একটা লোক হঠাৎ বেরিয়ে রাস্তার মাঝখানে এসে মিলবার্নের গাড়ির ঘোড়া দুটোকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ধরে ফেলল। অতএব গাড়িটা গেল থেমে।

লোকটা আর একজনের উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে বলে উঠল,—জো, তুমি এসে ঘোড়াদুটো সামলাও। আমি আরোহী দুজনের সঙ্গে কথা বলব।

ছায়ার আড়াল থেকে আর একটা লোক বেরিয়ে এসে বিনাবাক্যব্যয়ে ঘোড়াদুটোকে ধরে ফেলল। লোকটা একটু খর্বাকৃতি, শরীরটা একটু গাট্টাগোট্টা টাইপের, মুখমণ্ডল লাল, নীচের ঠোঁটটা বাঁকামতো। লোকটার পোশাকের মধ্যে নজরে পড়ার মতো জিনিস হল, পুরোনো আমলের বাদামি রঙের ঝালর দেওয়া একটা ওভারকোট, গলায় কালোরঙের একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ফার্ফ। মাথায় টুপি নেই। ও ঘোড়ার লাগাম ধরতেই অন্য লোকটা গাড়ির ওপর চওড়া কবজিওয়ালা হাত রেখে মিলবার্ন আর অ্যালফের দিকে তাকাল। চাঁদের আলোয় দেখা গেল, নীল দুটো চোখ, দৃষ্টিতে ক্রুরতা। মুখটা ভয়ংকর নিষ্ঠুর, পোড় খাওয়া। লোকটা ওর সঙ্গীকে বলে উঠল,—এই দুজনের মধ্যে ছোকরাটাকেই বাছা যাক—লড়াই ভালো জমবে।

মিলবার্ন রেগে বলে উঠলেন,—কে হে তুমি? তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়! চাবুক মেরে তোমায় সিধে করে দেব।

—একদম চুপ! আমার সঙ্গে এইভাবে কথা বললে ভালো হবে না বলছি। এখন তোমাদের দুজনের মধ্যে যে কেউ লক্ষ্মীছেলের মতো হাত তুলে নেমে এসো! লোকটা বলল।

অ্যালফ সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি থেকে লাফ মেরে রাস্তায় নেমে এসে বলল,—তুমি যদি লড়তেই চাও, আমার সঙ্গে লড়ো। বক্সিং-ই আমার পেশা।

—জো! তোমায় বলছিলাম না এতদিনে একটা ভালো প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া গেছে। তুমি আমায় একবার হারিয়েছিলে বহুকাল আগে। সেটা বাদ দিলে আমাকে সবাই অপরাজেয় বলেই জানে। ওহে ছোকরা, আমাকে দেখে তোমার কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয়?

অ্যালফ উত্তর দিল,—তুমি একটা উদ্ধত, দুর্বিনীত লোক। তোমার মুখেই খালি বড়-বড় কথা। সলিড কিছু নেই, শুধু গ্যাসে ভরা।

অ্যালফের কথা শুনে লোকটা নিজের উরুতে চাপড় মেরে ঘোড়ার মতো আওয়াজ করে হাসতে লাগল,—বেশ বলেছ কিন্তু। আমার সম্বন্ধে 'গ্যাস' কথাটাই ঠিক। যাহোক, এবার এসো। চাঁদের আলো থাকতে-থাকতে আমাদের লড়াইটা সেরে ফেলা যাক।

মিলবার্ন এতক্ষণ লোকটাকে কিছুটা কৌতূহল কিছুটা বিস্ময়ে লক্ষ করছিলেন। লোকটার পোশাকটা আস্তাবলে যারা কাজ করে অনেকটা তাদের মতো। টুপি, কোট, হাঁটু অবধি চাপা প্যান্ট, মোজা—এগুলি সবই নানা রঙের এবং যেন আদ্যিকালের। তবে হ্যাঁ, লোকটার পেটানো ইস্পাতের মতো শরীর দেখে মনে হয়, ও অসম্ভব শক্তিশালী। লন্ডনের বক্সার অ্যালফের হাতে বেদম মার খেয়ে লোকটা হেরে গেলে গল্পটা বেশ জমিয়ে শিবিরের লোকজনের কাছে করা যাবে, এই ভেবে মিলবার্ন মনে-মনে বেশ খুশি হলেন।

'এদিকে এসো' এই বলে লোকটা অ্যালফকে নিয়ে সেই লোহার গেটের দিকে এগোতে লাগল। জায়গাটায় গা-ছমছমে অন্ধকার। অ্যালফ রাস্তার ওপরেই লড়তে চাইলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটা বলল যে, রাস্তাটা পাকা লড়িয়েদের জায়গা নয়। তোমার কি আমার সঙ্গে যেতে ভয় লাগছে?' ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন লোকটার।

—তোমার মতো দশটা লোককেও আমি ভয় পাই না। বলল অ্যালফ।

—তাহলে অত কথার দরকার কী? এসো আমার সঙ্গে।

গাড়ির সহিস ঘোড়া দুটো ধরে রইল। ঘোড়াগুলো ঘামছিল আর যেন কোনও অজানা আশঙ্কায় মাঝে-মাঝে কেঁপে উঠছিল। চারজনের এই ছোট দলটা অর্থাৎ মিলবার্ন, অ্যালফ আর ওই দুজন গেট পেরিয়ে প্রায় পঞ্চাশ গজ হেঁটে গাছপালায় ভরা একটা জায়গায় এল। গাছপালার ভেতর দিয়ে একটু এগোতেই ঘাসে ঢাকা একটা ছোট গোলাকার ভূমি, চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। একটু দূরে একটা বহু পুরোনো পরিত্যক্ত বাড়ি। গোলাকার জায়গার একদিকটা একটু উঁচু। ঠিক যেন জমিটার পাড়।

জো নামের লোকটা বলল,—এরকম সুন্দর ন্যাচারাল বক্সিং রিং আশেপাশে কুড়ি মাইলের মধ্যেও কোথাও পাবে না। টম, এবার এই ছোকরাকে দেখিয়ে দাও তুমি কী করতে পারো।

পুরো ব্যাপারটাই যেন একটা অবিশ্বাস্য স্বপ্নের মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই অদ্ভুত লোকদুটো, ওদের বিচিত্র পোশাক ও কথা বলার ধরন, চাঁদের আলোয় আলোকিত এই ঘাসে ঢাকা ভূমি, দূরে একটা পরিত্যক্ত বাড়ি—সব মিলিয়ে যেন একটা অলৌকিক পরিবেশ। যাই হোক, অ্যালফ আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী টম নামের লোকটা কাছাকাছি আসতেই অ্যালফ ভয়ে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল,—এ কী! তোমার মাথায় কী হয়েছে?

টমের মাথায় কপাল বলে কিছু নেই—সেই জায়গায় একটা গোলাকার লাল ক্ষতচিহ্ন ঠিক মাথার চুল আর ভুরুর মাঝখানে।

—তুই এখন তোর নিজের মাথার কথা ভাব ছোকরা। টম বলল।

টম ততক্ষণে হাত তুলে দাঁড়িয়ে। ওর চওড়া বুক, ঢালু কাঁধ আর হাত দুটো দেখলেই বোঝা যায় যে চেহারাটা পাক্কা বক্সারের। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছিল, ঠোঁটে নিষ্ঠুর হাসির আভাস। অ্যালফ বুঝতে পারছিল যে এত মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বীর পাল্লায় সে আগে কখনও পড়েনি। কিন্তু অ্যালফও খুব সাহসী। নিজের ওপর আস্থা প্রচণ্ড, কেন না আজ পর্যন্ত কেউ ওকে হারাতে পারেনি। অ্যালফও উত্তরে একটু মৃদু হেসে হাত তুলে দাঁড়াল। লড়াইয়ের প্রস্তুতি শেষ।

কিন্তু তারপরে যা ঘটল, তা অ্যালফের কল্পনার বাইরে। টম বাঁ-হাতে চালাবে এরকম ভান করে, ডান হাতটা দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সজোরে এবং সপাটে মারল একটা মোক্ষম ঘুষি। সেটাকে আটকানোর কোনও সুযোগই পেল না অ্যালফ। তারপরেই টম ঝাঁপিয়ে পড়ল অ্যালফের ওপর এবং ওকে দু-হাতে তুলে শূন্যে ছুড়ে দিল। আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল অ্যালফ। টম তখন দু-হাত জড়ো করে চুপ করে দাঁড়িয়ে।

প্রচণ্ড রেগে গিয়ে অ্যালফ বলল,—এটা তো বেআইনি খেলা হচ্ছে!

মিলবার্নও বললেন,—এ তো অন্যায়! সমস্ত নিয়মকানুনের বাইরে।

জো বলল,—গুলি মারো তোমার আইনের। কীরকম সুন্দর ওকে তুলে ছুড়ে ফেলে দিল বলো তো? কী নিয়মে খেলো তোমরা?

—কেন, কুইনস্‌বেরি রুলে! ওতেই তো সবাই খেলে। বলল অ্যালফ।

—আমরা খেলি লন্ডনের অন্য রুলে। টমের মন্তব্য।

—বেশ, তাই হোক। বক্সিং-এর সঙ্গে কুস্তিও লড়ব। আমাকে তা হলে তুমি আগের মতো আর পাকে ফেলতে পারবে না। অ্যালফ বলল।

টম এবার এগিয়ে আসতেই অ্যালফ ওকে দুহাতে শক্ত করে চেপে ধরল। তারপর দুজনেই জাপটাজাপটি করতে করতে মাটিতে পড়ে গেল। তিনবার এইরকম হল। প্রতিবারই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে যাওয়ার পর উঠে দাঁড়িয়ে টম একটু দূরে পাড়ের মতো উঁচু জায়গাটায় গিয়ে বসছিল। এইরকমই একটা বিরতির সময়ে মিলবার্ন অ্যালফকে জিগ্যেস করলেন,—কী মনে হয় লোকটাকে দেখে?

—লোকটা বক্সিং-এ সত্যিই পারদর্শী। গায়ে সিংহের মতো শক্তি। শরীরটা যেন একটা তক্তা। প্রচুর চর্চা করেছে। তবে শিখেছে কোথায় বলতে পারব না। বলল অ্যালফ। কান থেকে একটু রক্তপাত ছাড়া অ্যালফের শরীরে চোখে পড়ার মতো কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই।

রাউন্ডের পর রাউন্ড চলতে লাগল দুজনের লড়াই। সন্দেহ নেই, অ্যালফ শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর পাল্লায় পড়েছে। টমের দ্রুত পায়ের কাজ, বিদ্যুৎগতিতে হাত চালানো, মুখে আলতোভাবে লেগে থাকা বদমায়েশি হাসি—এসব থেকে বোঝা যাচ্ছিল লোকটা বিপজ্জনক ধরনের। বারবার চেষ্টা করে শেষে ও অ্যালফের মুখে মারল একটা মারাত্মক আপারকাট। অ্যালফ মাটিতে পড়ে গেল। জো হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল,—টম, লাগাও ওইরকম আর একটা ঘুষি। তাহলেই কেল্লা ফতে।

চিন্তিত মিলবার্ন তখন অ্যালফকে বললেন,—ব্যাপারটা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে। তুমি এইরকম মার খেলে আমাদের ওখানে গিয়ে কেমন করে লড়বে? তার থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরং এর কাছে হার স্বীকার করে নাও।

—গুলি মারুন আপনাদের সার্জেন্ট বার্টনের সঙ্গে লড়াই। এই লোকটাকে হারিয়ে ওর মুখের হাসি মুছে না নেওয়া পর্যন্ত আমি লড়ে যাব। অ্যালফ উত্তর দিল।

—কী হল? লড়াইয়ের সাধ মিটেছে? টম বিদ্রূপের সুরে অ্যালফকে জিগ্যেস করল।

উত্তরে শরীরের শেষ শক্তিটুকু নিংড়ে নিয়ে টমের দিকে খ্যাপা ষাঁড়ের মতো এগিয়ে গেল অ্যালফ। কিছুক্ষণের জন্যে সে টমকে বেকায়দায় ফেলে দিলেও অক্লান্ত টম আবার আগের মতোই হাত চালাতে লাগল। অ্যালফের শক্তি তখন প্রায় শেষ—কিন্তু টমের ক্ষমতায় তখনও কোনও ঘাটতি নেই। টমের অবিরত ঘুষির আঘাতে জর্জরিত অ্যালফ হয়তো আর এক মিনিট পরেই ভূমিশয্যা নিত। কিন্তু হঠাৎ একটা কিছু ঘটে গেল।

কাছেই গাছপালা, ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল—যেন কোনও মানবশিশু বা জন্তুজানোয়ার ব্যথায় আর্তনাদ করছে। আওয়াজটা শুনেই টম হঠাৎ যেন অসহায় হয়ে পড়ল, ওর মুখে স্পষ্ট ভয়ের ছাপ। মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। আর্তস্বরে টম জো-কে বলল,—ওই দেখো! ও আবার আমাকে লক্ষ করে আওয়াজ করছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ওদিকে মন দিও না। কিছু হবে না তোমার। আগে এই ছোকরাকে হারাও। আশ্বাস দিল জো।

—না, না, তুমি বুঝতে পারছ না। যার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ, সে আমাকে আঘাত করবেই। হ্যাঁ, তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি। তার সামনে আমি দাঁড়াতে পারব না।

ভয়ে চিৎকার করতে-করতে টম দৌড়ে জঙ্গলের অন্যদিকে দৌড়ে গেল। জো-ও টমের জামাকাপড়গুলো কুড়িয়ে নিয়ে টমের পিছনে-পিছনে দৌড়োল। গাছগুলোর ছায়া যেন দুজনকে গ্রাস করে নিল।

মার খেয়ে প্রায় অচেতন অ্যালফ তখন কোনওরকমে টলতে-টলতে এসে মিলবার্নের কাঁধে মাথা রাখল। মিলবার্ন ওর ঠোঁটে লাগিয়ে দিলেন ব্র্যান্ডির বোতলটা। জঙ্গলের দিক থেকে আসা সেই আওয়াজটা তখন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। তারপরে দেখা গেল, ঝোপের মধ্যে থেকে একটা সাদা রঙের কুকুর বেরিয়ে এসে যেন কাউকে খুঁজতে-খুঁজতে দৌড়ে চলে গেল। কেঁউ-কেঁউ আওয়াজ করতে-করতে।

একটু পরে কুকুরটাও যেন ছায়ার মধ্যে হারিয়ে গেল। মিলবার্ন আর অ্যালফ তখন একটা অজানা আশঙ্কায় আর ভয়ে শিউয়ে উঠে কালক্ষেপ না করে সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। গাড়িতে মাইলদুয়েক যাওয়ার পর মিলবার্নের মুখ থেকে আওয়াজ বেরোল,—এইরকম টাইপের কুকুর তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে কখনও দেখেছ?

—না। আর যেন দেখতেও না হয়। আর্তস্বরে বলল অ্যালফ।

রাত একটু গভীর হতেই দুজনে আশ্রয় নিলেন এক সরাইখানায়। খাওয়াদাওয়ার পর একটা পানীয় নিয়ে বসে কথা হচ্ছিল সরাইখানার মালিক আর স্থানীয় এক ভদ্রলোক মিঃ হরনারের সঙ্গে। হরনার বক্সিং-এর ব্যাপারে বেশ ওয়াকিবহাল। উনি হঠাৎ বললেন,—অ্যালফ, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুনি কোথাও বক্সিং লড়ে এসেছ। কিন্তু কই, আজকের কাগজে তো কোনও বক্সিং প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন ছিল না।

—থাকগে ওসব কথা। অ্যালফ বলল।

হঠাৎ হরনারের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল,—আচ্ছা, ব্রোকাসের সেই তথাকথিত বদমেজাজি বক্সারটার সঙ্গে কি তোমাদের পথে দেখা হয়েছিল?

অ্যালফ বলল,—যদি দেখা হয়েই থাকে তো কী?

—আমাদের এখানকার বিখ্যাত বক্সার বব মেডোসকে ওই লোকটাই একবার ব্রোকাস কোর্টে লড়াই করতে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। লোকটার একটা সঙ্গীও আছে বলে শুনেছি। পরেরদিন সকালে বব মেডোসকে গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় ওখানে পাওয়া যায়। বললেন হরনার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলবার্ন আস্তে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁদের সঙ্গেও ওই লোকটারই দেখা হয়েছিল।

সরাইখানার মালিক তখন ফিসফিস করে মিলবার্নকে জিগ্যেস করলেন,—মেডোস বলেছিল ওই লোকদুটোর পোশাক নাকি আমাদের ঠাকুরদার আমলের—সেটা কি সত্যি? আর বক্সার লোকটার কপাল বলতে নাকি কিছু নেই?

—মেডোস ঠিকই বলেছিল। আমাদের অভিজ্ঞতাও তাই। বললেন মিলবার্ন।

সরাইখানার মালিক তখন উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন,—ব্যাপারটা আপনাদের খুলেই বলি। এই অঞ্চলের বিখ্যাত বক্সার টম হিকম্যান আর তার বন্ধু জো রো ঠিক ওই ব্রোকাস কোর্টের কাছেই বহুকাল আগে, সম্ভবত ১৮২২ সালে, মত্ত অবস্থায় ঘোড়ার গাড়ি চালাতে চালাতে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল। দুজনেই মারা গেছল। গাড়ির চাকাটা নাকি হিক্‌ম্যানের কপালের ওপর দিয়ে চলে গেছল।

—হিক্‌ম্যান! হিক্‌ম্যান! আচ্ছা, ওকেই তো লোকে 'গ্যাসম্যান' নামে ডাকত, তাই না? জিগ্যেস করলেন মিলবার্ন।

—ঠিক তাই। ওকে অনেকে 'গ্যাস' বলে ডাকত। বললেন সরাইখানার মালিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইসব শুনে অ্যালফের মুখ তখন চকের মতো সাদা হয়ে গেছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—আর ভালো লাগছে না। চলুন, এবার রওনা হই।

সরাইখানার মালিক অ্যালফের পিঠ চাপড়ে বললেন,—মন খারাপ কোরো না। তুমিই আজ পর্যন্ত একমাত্র লোক যে ওই পাজিটার হাতে পরাজিত হওনি। গ্যাসম্যানকে পিটিয়ে তুমি অনেকের প্রতি ওর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছ। নাও, আরেকটা পানীয় নাও, তোমার এই কৃতিত্বের জন্য। তুমি জানো, সরাইখানার এই ঘরে ও একবার কী করেছিল—সেই ছাপান্ন বছর আগে?

মিলবার্ন, অ্যালফ, হরনার সকলেই ঘরের চারদিকটা দেখলেন। উঁচু সিলিং, পাথরের মেঝে, কাঠে মোড়া দেওয়াল।

সরাইখানার মালিক বললেন,—হ্যাঁ, এই ঘরেই। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাকে ঘটনাটা বলেছিলেন। সেদিন এই অঞ্চলে একটা বড় বক্সিং প্রতিযোগিতা ছিল। টম তাতে বাজি রেখে বেশ কিছু টাকা জিতেছিল। ও আর বন্ধু জো ফেরার পথে সম্পূর্ণ মত্ত অবস্থায় সরাইখানার এই ঘরেই এসেছিল। ওকে দেখে এখানকার লোকজন সবাই ভয়ে কুঁকড়ে যায়, কেউ-কেউ টেবিলের নীচেও লুকিয়ে পড়ে। কেন না ওর মুখে সেই খুনির হাসি আর হাতে একটা লোহার রড। সবাই জানত টম মত্ত অবস্থায় খুন পর্যন্ত করতে পারে। ও কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করল জানো? ডিসেম্বরের ঠান্ডার থেকে বাঁচতে একটা ছোট সাদা কুকুর ফায়ার প্লেসের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল। টম রডের এক ঘায়ে কুকুরটার পিঠ ভেঙে দিল। তারপর পাগলের মতো হাসতে-হাসতে আর গালিগালাজ করতে-করতে টম ওর বন্ধু জো-কে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে বসে জোরে গাড়ি চালিয়ে দিল। পরে শোনা গেছিল, ওই রাতেই দুর্ঘটনায় গাড়ির একটা চাকায় মাথা থেঁতলে টম মারা যায়। জো-ও মারা গেছল। অনেকেই নাকি এখনও ওই কুকুরটাকে দেখতে পায়—পিঠ ভাঙা, রক্তাক্ত, কেঁউ কেঁউ আওয়াজ করছে। যেন কুকুরটা তার আততায়ীকে আজও খুঁজে বেড়াচ্ছে। সুতরাং অ্যালফ, তুমি নিজে লড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আরও কারোর জন্যেও লড়াই করেছ।

অ্যালফ বলল,—তা হতে পারে। তবে এই ধরনের লড়াই আমি করতে চাই না। এখন সার্জেন্ট বার্টনের সঙ্গে লড়াই করলেই যথেষ্ট। মিঃ মিলবার্ন, চলুন, আমরা বরং একটা ট্রেনে করেই আপনাদের ক্যাম্পে যাই।

'The Bully of the Brokers Court' গল্পের অনুবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবতার আংটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লন্ডনের ১৪৭এ, গাওয়ার স্ট্রিটের বাসিন্দা জন ভ্যানসিটার্ট স্মিথ সহজেই বৈজ্ঞানিক হিসেবে নাম করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও তীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তি তাঁকে কোনও একটি বিষয়ে স্থির থাকতে দেয়নি। অতএব প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যায় বিশারদ হতে হতে তিনি হঠাৎ রসায়ন শাস্ত্রে উৎসাহী হয়ে পড়লেন। কিন্তু তার বছরখানেক পরেই প্রাচ্যতত্ত্ব তাঁকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করল। প্রাচীন মিশরের বর্ণমালা এবং লৌকিক দেবতার সম্বন্ধে তাঁর একটা গবেষণাপত্র প্রাচ্যতত্ত্বে উৎসাহীদের কাছে বিশেষ খ্যাতি পেল।

এরপরে স্মিথ প্রাচীন মিশরের ব্যাপারে, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও কলায় মিশরের অবদান সম্বন্ধে এতটাই উৎসাহী হয়ে পড়লেন যে, তিনি মিশর-বিশেষজ্ঞ এক মহিলাকে বিয়ে করে ফেললেন। স্মিথের স্ত্রী মিশরের ষষ্ঠ রাজবংশের ওপর গবেষণা করেছেন। এবার স্মিথও শুরু করলেন প্রাচীন মিশরের ওপর বেশ বড়সড় গবেষণার কাজ। ঘনঘন যেতে লাগলেন প্যারিসের লুভ্‌র মিউজিয়ামে তাঁর গবেষণার কাজে। সম্প্রতি এইরকমই একবার লুভ্‌র-এ গিয়ে তিনি এক অত্যাশ্চর্য ঘটনায় জড়িয়ে পড়লেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মিথের সেদিন একটু জ্বর জ্বর ভাব। লন্ডন থেকে প্যারিস পৌঁছে হোটেলে উঠেই শুয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘুম এল না—ঘণ্টাদুয়েক বিছানায় এপাশ ওপাশ করার পর উঠে পড়লেন। বর্ষাতি পরে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে লুভ্‌র-এ চলে গেলেন। মিউজিয়ামের যে ঘরে প্যাপিরাস সংক্রান্ত সংগ্রহ, সেই ঘরে গিয়ে তাঁর অসমাপ্ত গবেষণার কাজ শুরু করে দিলেন।

স্মিথকে কোনওভাবেই সুদর্শন বলা যাবে না। তাঁর খাঁড়ার মতো নাক আর থুতনির বিচিত্র গড়ন, এবং কথা বলার সময়ে পাখির মতো মাথার নড়াচড়া—সব মিলিয়ে তাঁর চেহারাটা অদ্ভুত। মিউজিয়ামের ঘরের আয়নায় বর্ষাতির কলার কান পর্যন্ত তুলে দেওয়া নিজের প্রতিবিম্ব দেখে স্মিথ নিজেই বুঝতে পারছিলেন তাঁর চেহারার বিচিত্রতা। কিন্তু ইংল্যান্ডের দুটি ছাত্র তাঁকে অন্য দেশের লোক ভেবে তাঁর সম্বন্ধে ইংরেজিতে বেশ কয়েকটা বাছা বাছা বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করছিল, যেমন, 'লোকটার চেহারা কীরকম কিম্ভুত!' 'মিশরের মমি নিয়ে কাজ করতে করতে লোকটার চেহারাই মমি-র মতো হয়ে গেছে', 'লোকটাকে দেখে মিশরীয় বলেই মনে হয়!' ইত্যাদি।

স্মিথ চটে গিয়ে ছেলে দুটোকে ইংরেজিতে একটু কড়কে দেবেন বলে ঘুরে দাঁড়ালেন। এবং তখনই বুঝতে পারলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, ছেলে দুটোর মন্তব্যের লক্ষ তিনি নন, বরং মিউজিয়ামের যে কয়েকজন কর্মচারী তখন পিতলের জিনিসগুলো পরিষ্কার করছিল, তাদের একজন।

ছাত্র দুটি একটু পরেই সেখান থেকে চলে গেল। তখন স্মিথ বিশেষ মনোযোগ দিয়ে ওই কর্মচারীকে লক্ষ করলেন। তাঁর দেখা অনেক মমি ও ছবিতে প্রাচীন মিশরীয়দের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই লোকটার চেহারার অদ্ভুত মিল—কাটা কাটা মুখের গড়ন, একটু চওড়া কপাল, গোল থুতনি এবং গায়ের কালচে রং। লোকটি অবশ্যই মিশরের—স্মিথ নিঃসন্দেহ হলেন।

আলাপ করবেন ভেবে লোকটির দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে স্মিথ প্রায় শিউরে উঠলেন ওকে দেখে—মুখটা যেন সাধারণ মানুষের নয়, প্রায় অতিপ্রাকৃতিক। ওর কপাল ও চোয়াল এত মসৃণ যে, সেগুলো যেন চামড়ার নয়, যেন পার্চমেন্ট কাগজে তৈরি, পালিশ করা। চামড়ার ওপর রোমকূপের কোনও চিহ্ন নেই। চামড়াতে নেই কোনও স্বাভাবিক আর্দ্রতাও। কপাল থেকে থুতনি পর্যন্ত অজস্র বলিরেখা।

—এই পিতলের জিনিসগুলো কি মেমফিস থেকে পাওয়া? কোনওরকমে আলাপ শুরু করার জন্য লোকটিকে জিগ্যেস করলেন স্মিথ।

—হ্যাঁ, অন্যদিকে তাকিয়ে জবাব দিল লোকটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আপনি কি মিশরের লোক? স্মিথের প্রশ্ন।

লোকটা এবার পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল স্মিথের দিকে। তার চোখদুটো যেন কাচ দিয়ে তৈরি, সেইসঙ্গে একটা শুকনো চকচকে ভাব। মানুষের চোখ যে এইরকম হতে পারে তা স্মিথের ধারণার বাইরে। দৃষ্টির গভীরে যেন ভয় ও ঘৃণার যুগপৎ ছাপ।

—না, আমি ফ্রান্সেরই। বলে লোকটা নিজের কাজে মন দিল। খানিকটা বিস্ময়বিহ্বল হয়েই স্মিথ পাশের ঘরে গিয়ে একটা নিভৃত কোণে চেয়ারে বসে তাঁর গবেষণার কাজ শুরু করলেন। কিন্তু কাজ করবেন কী? মন পড়ে আছে স্ফিংক্স-এর মতো অদ্ভুত মুখের অধিকারী সেই লোকটার ওপর। চোখ দুটো যেন কুমির বা সাপের চোখের মতো—এমন একটা চকচকে ভাব। কিন্তু সেই চোখে শক্তি ও প্রজ্ঞার ছাপও আছে। আর যেন আছে অপরিসীম ক্লান্তি ও হতাশার অভিব্যক্তি।

এইসব ভাবতে ভাবতে স্মিথ তাঁর গবেষণার নোটস লিখতে শুরু করলেন। কিন্তু শরীরটা কাহিল ছিল বলে খানিকক্ষণ পরে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়লেন স্মিথ। এত গভীর সেই ঘুম যে তিনি জানতেও পারলেন না কখন মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে গেছে।

ধীরে-ধীরে রাত বাড়তে লাগল। নোত্র দাম গির্জার ঘড়িতে মধ্যরাতের ঘণ্টা বাজল। রাত একটার পর ঘুম ভাঙল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মিথের। শরীরটা এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে। কাচের বাক্সে রাখা মমিগুলো এবং প্রাচীন মিশরের অন্য জিনিসপত্র দেখে তাঁর মনে পড়ল যে তিনি এখন কোথায়। জানলার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। স্মিথ এমনিতে বেশ সাহসী। আড়মোড়া ভেঙে মনে মনে একটু হেসে নিলেন। পরিস্থিতিটা বেশ মজার—গার্ডরা ভেতরটা ভালোভাবে না দেখেই মিউজিয়ামের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

বাইরে আলো ঝলমলে প্যারিস। আর এই হলঘরের নৈঃশব্দ্যে ডুবে আছে কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস। থিবস, লুকসার, হেলিওপোলিস ও কত না প্রাচীন মন্দির ও স্মৃতিসৌধ থেকে আনা মানুষের দেহ আর তাদের ব্যবহৃত জিনিস। যেন মহাকালের সমুদ্রে জলে ভেসে আসা অতীতের স্মৃতিচিহ্ন। চাঁদের আলোয় লম্বা হলঘরে সারি দিয়ে রাখা মূর্তি ও বিভিন্ন বস্তুর দিকে তাকিয়ে প্রায় দার্শনিক চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন স্মিথ। হঠাৎ দেখতে পেলেন দূরে এক কোণায় একটু হলদে আলোর আভা।

আলোটা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। একটু ভয় লাগলেও তীব্র কৌতূহলে স্মিথ চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। যার হাতে আলো তার পায়ের শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। আলোটা আরও কাছে আসতে স্মিথ দেখলেন আলোর পিছনে হাওয়ায় প্রায় ভাসমান একটা মুখ। ছায়া সত্ত্বেও মুখটা চিনতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মিথের একটুও সময় লাগল না—সেই কাচের মতো চোখ, সেই মৃত মানুষের মতো চামড়া। হ্যাঁ, মিউজিয়ামের সেই কর্মী।

স্মিথ প্রথমে ঠিক করলেন লোকটির সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু ওর ভাবভঙ্গি, বিশেষত চোরের মতো পা টিপে চলা, ডানদিকে বাঁ-দিকে তাকানো ইত্যাদি দেখে স্মিথ লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে লক্ষ করাই সমীচীন মনে করলেন।

লোকটা যেন জানে ওকে কোথায় যেতে হবে। ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত প্রত্যয়ের সঙ্গে ও পৌঁছোল একটা বড় কাচের বাক্সের কাছে। বাক্সর মধ্যে কয়েকটা মমি রাখা। পকেট থেকে একটা চাবি বের করে বাক্সের ওপরের ডালা খুলে একটা মমি নামিয়ে খুব সাবধানে সেটিকে কোলে করে নিয়ে একটু দূরে—মেঝের ওপর শুইয়ে দিল। তারপরে মমিটার পাশে বসে মমির ওপর জড়ানো ব্যান্ডেজের মতো কাপড়টা আস্তে আস্তে খুলতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে নানারকম ভেষজদ্রব্যের তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল।

বোঝাই যাচ্ছে এই মমিটার ব্যান্ডেজ এর আগে কখনও খোলা হয়নি। তাই অদম্য কৌতূহলের সঙ্গে স্মিথ রুদ্ধশ্বাসে পুরো ব্যাপারটা দেখতে থাকলেন। মাথার ওপর থেকে ব্যান্ডেজের শেষ অংশটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল চার হাজার বছরের পুরোনো দেহের মাথার ওপরের লম্বা, কালো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চকচকে চুলের রাশি। ব্যান্ডেজটা আরেকটু খুলতেই দেখা গেল ফরসা ছোট কপাল আর সুন্দর বাঁকানো ভ্রু। এর পরে চোখে পড়ল এক জোড়া উজ্জ্বল চোখ ও একটা টিকোলো নাক। সবশেষে বেরোল ঠোঁট ও সুন্দর থুতনি। পুরো মুখটা নিখুত সুন্দর, শুধু কপালে কফি রঙের একটা দাগ।

লোকটা এবার মমির মুখ দেখে যেন আত্মহারা হয়ে পড়ল। দু-হাত শূন্যে ছুড়ে, দুর্বোধ্য ভাষায় অনেক কিছু বলে সে মমিটাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরল। প্রচণ্ড আবেগে লোকটার গলার স্বর জড়িয়ে যাচ্ছে, মুখের ওপরে বলিরেখা কেঁপে কেঁপে উঠছে, কিন্তু স্মিথ অবাক হয়ে দেখলেন ওর কাচের মতো চোখে কোনও আর্দ্রতা নেই। বেশ কিছুক্ষণ ওই সুন্দরীর মৃতদেহের কাছে বসে, কথা বলে লোকটা হঠাৎ উঠে পড়ল।

হলঘরের মাঝখানে কাচের একটা গোল বাক্সে প্রাচীন মিশরের অনেক আংটি ও দামি পাথর রাখা আছে। লোকটা প্যাকেট থেকে একটা শিশি বার করল। এবার বেশ কিছু আংটি ওই বাক্স থেকে বের করে শিশিতে রাখা জলীয় পদার্থ লাগিয়ে আংটিগুলো একটা একটা করে পরীক্ষা করতে লাগল। বেশ কয়েকটা আংটি এভাবে দেখার পর একটা ক্রিস্টাল বসানো বড় আংটিতে জলীয় পদার্থ লাগিয়েই আনন্দে দু-হাত তুলে লোকটা লাফিয়ে উঠল। আর তখনই শিশিটা কাত হয়ে জলীয় পদার্থটা মেঝের ওপর পড়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটা রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে ঘরের কোণের দিকে যেতেই লোকটার একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলেন ভ্যানসিটার্ট স্মিথ।

চোখে একরাশ বিদ্বেষ নিয়ে লোকটা স্মিথকে জিগ্যেস করল,—আপনি এতক্ষণ আমাকে দেখছিলেন? দশ মিনিট আগে যদি আপনাকে দেখতে পেতাম, তাহলে আমার এই ছুরি আপনার বুকে বিঁধিয়ে দিতাম। এবার বলুন, আপনি কে?

স্মিথ নিজের পরিচয় দিতেই লোকটা অবজ্ঞার সঙ্গে বলল,—ও! পুরোনো মিশরের ওপর আপনার একটা লেখা আমি পড়েছি। মিশর সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান তো প্রায় নেই বললেই চলে। আমাদের জীবন দর্শন সম্বন্ধে আপনারা তো কিছুই জানেন না!

স্মিথ-এর প্রতিবাদ করার আগেই হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ে গেল মমিটার দিকে। লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে হাতের আলোটা মমির দিকে ফেরাল। এই দশ মিনিটে হাওয়ার সংস্পর্শে এসে মৃতদেহটির অবস্থার অবনতি হয়েছে—খসে পড়েছে চামড়া, চোখ হয়ে গেছে কোটারাগত এবং ঠোঁটের মাংস কুঁচকে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে হলদে দাঁতের সারি। গভীর দুঃখে ও হতাশায় লোকটা তখন মুহ্যমান। কাঁপা গলায় সে স্মিথকে বলল,—আজ রাতে যা করব ভেবেছিলাম, তা করেছি। এখন আর কিছু যায় আসে না। ওর আত্মার সঙ্গে গিয়ে মিলতে পারলেই হল। ওর এই নিষ্প্রাণ দেহের কী-ই বা মূল্য আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মিথ এবার প্রায় নিশ্চিত যে লোকটা বদ্ধ উন্মাদ। কিন্তু লোকটা হঠাৎ খুবই স্বাভাবিকভাবে স্মিথকে বলল,—আসুন, আপনাকে যাওয়ার রাস্তাটা দেখিয়ে দিই।

অনেকগুলো হলঘর পেরিয়ে একটা ছোট দরজা খুলে লোকটা স্মিথকে নিয়ে একটা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল। একটা আধখোলা দরজার কাছে গিয়ে লোকটা স্মিথকে বলল,—এই ঘরে আসুন।

স্মিথ এই রহস্যের শেষ দেখতে চান। তাই ভয়ের চেয়ে তাঁর তখন কৌতূহলের মাত্রা অনেক বেশি। ঘরে ঢুকে দেখলেন, প্রাচীন আমলের আসবাবপত্র ও টুকিটাকি জিনিস দিয়ে ঘরটা সাজানো।

লোকটা এবার শুরু করল তার কাহিনি ঃ

—আমি এখন পরলোকের চৌকাটে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে। তাই এখন আপনাকে বলে যেতে চাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়ার পরিণামের এই কাহিনি।

বুঝতেই পারছেন আমি একজন মিশরীয়। আমার জন্ম হয়েছিল খ্রিস্টের জন্মের ষোলোশো বছর আগে রাজা তুথমোসিসের আমলে এক সম্পন্ন পরিবারে। আমার নাম সোসরা। আমার বাবা ছিলেন নীলনদের তীরে বিখ্যাত আবারিস মন্দিরে দেবতা ওসাইরিস-এর পূজারি। ষোলো বছর বয়সেই বাবার কাছ থেকে যা কিছু শেখার সব শিখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েছিলাম। তারপর প্রকৃতির নানাবিধ রহস্য, বিশেষত জীবনের স্বরূপ নিয়ে নিজে নিজে পড়াশোনা শুরু করলাম। শরীরে রোগবালাই হলে মানুষ ওষুধের সাহায্যে তা সারায়। আমার কিন্তু মনে হল, শরীরটাকে এমনভাবে রাখতে হবে যে তাকে কোনও রোগ বা দুর্বলতা যেন ছুঁতেই না পারে। শুরু হল আমার দীর্ঘ গবেষণা। পরীক্ষা চালালাম প্রথমে জন্তুজানোয়ার, তারপর ক্রীতদাসদের শরীরের ওপর। সবশেষে আমার নিজের ওপর।

এই গবেষণার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে কোনও লাভ নেই, কেন না আপনি তার কিছুই বুঝতে পারবেন না। শুধু এটুকু বললেই হবে যে, শেষে আমি এমন একটা ওষুধ আবিষ্কার করলাম যা ইঞ্জেকশন দিয়ে একবার শরীরে রক্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে মানুষ অমর না হলেও কয়েক হাজার বছর নীরোগ হয়ে বেঁচে থাকতে পারে। একটা বেড়ালকে ওই ওষুধের ইঞ্জেকশন দিয়েছিলাম। তারপর মারাত্মক সব বিষ দেওয়ার পরেও বেড়ালটা মরেনি। আজও ওই বেড়ালটা মিশরে আছে—জ্যান্ত।

অতি দীর্ঘকাল সুস্থভাবে বেঁচে থাকার আশায় এবং যৌবনের উৎসাহে সেই অভিশপ্ত ওষুধ আমার শরীরে ঢোকালাম। তারপর ইচ্ছে হল আরও কারও উপকার করার। দেবতা থোত-এর মন্দিরে এক অল্পবয়স্ক পূজারি ছিল নাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারমেস। আমার ওষুধের কথা ওকে বুঝিয়ে বললাম এবং ওর শরীরেও ঢোকালাম সেই ওষুধ। এখন বুঝি, আমার সমবয়স্ক কাউকে এই ওষুধটা দেওয়া ঠিক হয়নি।

এর পরে আমার পড়াশোনা ও গবেষণার কাজ অনেক কমিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু পারমেস রসায়নের যন্ত্রপাতি নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকত। যদিও ওর গবেষণার বিষয়বস্তু বা তার প্রগতি নিয়ে আমায় কখনও কিছু বলত না।

একদিন পারমেসের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ একটি পরমাসুন্দরী মেয়েকে দেখতে পেলাম। কয়েকজন ক্রীতদাস মেয়েটিকে একটা ডুলিতে করে কোথাও নিয়ে যাচ্ছিল। খোঁজ নিয়ে জানলাম, মেয়েটি আমাদের স্থানীয় প্রশাসকের কন্যা। মেয়েটিকে দেখেই আমার এত ভালো লেগে গেল যে মনে হল এর সঙ্গে আমার বিয়ে না হলে আমার জীবনই বৃথা। আমার মনের এই কথা পারমেসকে বলতেই দেখলাম ওর মুখটা কেমন কালো হয়ে গেল।

মেয়েটির নাম আত্মা। ওর সঙ্গে ধীরে ধীরে আমার পরিচয় হল। আত্মাও আমাকে বেশ পছন্দ করে দেখলাম। পারমেসও আত্মাকে ভালোবাসত। কিন্তু আত্মার আকর্ষণ ছিল আমারই ওপর। হঠাৎ এই সময় আমাদের শহরে প্লেগের মহামারী শুরু হল। আমার তো কোনও রোগের ভয় নেই—তাই নির্দ্বিধায় প্লেগের রোগীদের সেবাশুশ্রূষা করতে লাগলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মা ব্যাপারটা দেখে একটু অবাক হল। তখন একদিন ওকে আমার আবিষ্কৃত আশ্চর্য ওষুধের কথাটা বলে ফেললাম। আত্মাকে আমি অনুরোধও করলাম ওষুধটা ব্যবহার করতে যাতে আমরা দুজনে একসঙ্গে অসংখ্য যুগ বেঁচে থাকতে পারি। আত্মা কিন্তু আপত্তি করল,—এ তো ঈশ্বর ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া। পরম করুণাময় দেবতা ওসাইরিস যদি চাইতেন, তাহলে তিনিই আমাদের দীর্ঘ জীবন দিতেন।

যাই হোক, আত্মাকে বললাম ব্যাপারটা একদিন ভেবে দেখে পরের দিন সকালে আমাকে ওর সিদ্ধান্ত জানাতে।

পরের দিন সকালে মন্দিরের পুজো শেষ হওয়ার পরেই আমি আত্মাদের বাড়ি গেলাম অধীর ঔৎসুক্যে—আত্মা আমার প্রস্তাবে রাজি কি না জানতে। কিন্তু ওদের বাড়িতে যেতেই একজন দাসী আমায় জানাল, আত্মা অসুস্থ। ওর ঘরে ঢুকে দেখলাম—আত্মা বিছানায় শুয়ে! মুখ পাণ্ডুর, চোখ ছলছলে। কপালের একটা অংশে বেগুনি রঙের ছাপ। এক মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম—আত্মা প্লেগের শিকার হয়েছে, কপালে নিশ্চিত মৃত্যুর পরোয়ানা।

আত্মার এই অবস্থা দেখে আমি দুঃখে হতাশায় প্রায় পাগল হয়ে গেলাম। ওকে ছাড়া আমার এই সুদীর্ঘ যুগ-যুগ ব্যাপী জীবন আমি কী করে কাটাব? আমার এই মানসিক অবস্থার মধ্যে একদিন পারমেস জিগ্যেস করল,—তুমি আত্মাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরতে দিলে কেন? ওকে তো তোমার ওষুধটা দিতে পারতে!

আমি বললাম,—আমি দেরি করে ফেলেছিলাম। এখন ভগবান জানেন কত শতাব্দীর পর আমার মৃত্যু হবে আর তারপর আত্মাকে দেখতে পাব। ভাই পারমেস, তুমি এখন কী করবে? তুমিও তো আত্মাকে ভালোবাসতে!

প্রায় অপ্রকৃতিস্থ লোকের মতো হেসে পারমেস বলল,—আমার এতে কিছু যায় আসে না। আত্মার দেহটাকে নানা মশলা ও সুগন্ধি দ্রব্য মাখিয়ে এতক্ষণে মমি বানানো হয়ে গেছে। ওকে রাখা হয়েছে শহরের বাইরে সমাধিক্ষেত্রের একটা কক্ষে। আমি ওর কাছে চললাম—মরতে।

—তার মানে?

পারমেস বলল,—আমি এতকাল গবেষণা করে তোমার ওষুধের একটা প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছি। সেই প্রতিষেধক এখন আমার শরীরে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমার মৃত্যু নিশ্চিত এবং তারপর আমি পরলোকে আত্মার কাছে পৌঁছে যাব।

—তাহলে আমাকেও তোমার ওই প্রতিষেধকটা দাও। আমিও মরতে চাই!

—তোমাকে প্রতিষেধক দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তুমি এই নিঃসঙ্গ জীবনের বোঝা বহু শতাব্দী ধরে বয়ে বেড়াবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ঠিক আছে। তাহলে আমি নিজেই গবেষণা করে ওই প্রতিষেধক আবিষ্কার করে নেব। আমি বললাম।

পারমেস উত্তর দিল,—মুর্খ! তোমার পক্ষে এই প্রতিষেধক তৈরি করা অসম্ভব, কেন না তার জন্যে এমন একটা দ্রব্য লাগবে যা তুমি কোথাও পাবে না। এই ওষুধ তৈরি করা আর সম্ভব নয়। কেবল দেবতা থোতের একটা আংটির মধ্যে আমার তৈরি এই ওষুধ একটু আছে।

—তাহলে আমায় বলো, দেবতা থোতের ওই আংটি কোথায় আছে?

—সেটাও তোমায় বলব না। আত্মা তোমাকে পছন্দ করলেও শেষ পর্যন্ত ওকে কে পাবে? আমি! আমি পরলোকের দিকে চললাম, তুমি থাকো তোমার অভিশপ্ত জীবন নিয়ে। এই বলে পারমেস চলে গেল। পরের দিন খবর পেলাম ওর মৃত্যু হয়েছে।

তারপর মাসের পর মাস আমি ডুবে গেলাম রাসায়নিক গবেষণায়—আমার ওষুধের প্রতিষেধকের খোঁজে। কিন্তু কোনও সফলতা পাওয়া গেল না। খুব হতাশ হয়ে পড়লে কখনও কখনও আত্মার সমাধির কাছে গিয়ে বসে থাকতাম আর ভাবতাম কবে পরলোকে ওর সঙ্গে দেখা হবে।

পারমেস বলেছিল, ওর ওষুধের খানিকটা আছে দেবতা থোতের আংটির মধ্যে। এই আংটি সম্বন্ধে আমি জানতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্ল্যাটিনামের আংটি—তার সঙ্গে একটা ফাঁপা ক্রিস্টাল। হয়তো সেই ফাঁপা অংশে পারমেসের প্রতিষেধকটা আছে। কিন্তু কোথায় পাব সেই আংটি? পারমেসের আঙুলে ওই আংটি দেখতে পাইনি। ওর ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র তন্নতন্ন করে খুঁজেও, এমনকী, পারমেসের চলা রাস্তাগুলো দেখেও, ওই আংটির কোনও হদিস পেলাম না।

এদিকে আমাদের দেশে তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। পাশের দেশের এক বর্বর উপজাতি আমাদের আক্রমণ করে বহু লোকের প্রাণনাশ করল। আমরা যুদ্ধে প্রায় হেরেই গেলাম। আমি বন্দি হলাম শত্রুদের হাতে।

তারপর বহু বছর সেই শত্রুর দেশে বন্দি অবস্থায় ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেষপালকের কাজ করে আমার দিন কাটতে থাকল। আমার মালিক মারা গেল, তার ছেলেও বুড়ো হয়ে গেল—কিন্তু আমার মরণ নেই।

এরপর হঠাৎ একবার সুযোগ পেয়ে পালিয়ে চলে এলাম আমাদের দেশে—মিশরে। সবকিছু পালটে গেছে। সিংহাসনে বিদেশি রাজা। আমার চেনা শহরকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরের জায়গায় একটা কুৎসিত ঢিপি। সমাধিকক্ষগুলো সব তছনছ করা হয়েছে। আত্মার সমাধির কোনও চিহ্ন নেই। পারমেসের কাগজপত্র বা জিনিসের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর আমি প্রতিষেধকের বা দেবতা থোতের আংটি খুঁজে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে জীবন কাটাতে লাগলাম। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। কত কিছুই আমার সামনে ঘটে গেল। ইলিয়মের পতন, মেমফিস-এ হেরোডোটাসের আগমন, খ্রিস্টধর্মের সূচনা। আমার বয়স কয়েকশো বছর হয়ে গেল—কিন্তু দেখে কেউ বুঝবে না। আমারই আবিষ্কৃত সেই অভিশপ্ত ওষুধ আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাঁচিয়ে রেখেছে। যাক, এতদিনে আমি মৃত্যুর দোরগোড়ার কাছে এসে পৌঁছেছি।

বহু দেশ ঘুরেছি। বহু ভাষা জানি। সভ্যতার এই বিবর্তন আমার চোখের সামনে ঘটেছে। কিন্তু আত্মার প্রতি আমার আকর্ষণ এখনও অবিচল। প্রাচীন মিশরের ওপর গবেষক ও পণ্ডিতরা যা লেখেন, তা গোগ্রাসে গিলি।

প্রায় ন'মাস আগে সানফ্রান্সিসকো গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে হঠাৎ একটা লেখা থেকে জানতে পারলাম যে আমার জন্মস্থান আবারিস-এর কাছে প্রাচীন মিশরের বেশ কিছু পুরোনো জিনিস পাওয়া গেছে। তার মধ্যে আছে একটি মেয়ের মমি—সুন্দরভাবে রাখা, আগে কখনও খোলা হয়নি। মমির বাক্সের ওপর খোদাই করা লেখা থেকে জানা যায়, দেহটি রাজা তুথমোসিস-এর সময়ে আবারিস শহরের প্রশাসকের কন্যার। এবং দেহের ওপর রাখা ক্রিস্টাল বসানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্ল্যাটিনামের একটা আংটি। এতদিনে বুঝলাম, কীরকম চালাকি করে পারমেস আংটিটা লুকিয়ে রেখেছিল। কেন না কোনও মিশরীয় কখনও মৃতদেহের বাক্স খুলবে না পাপের ভয়ে।

সেই রাতেই সানফ্রান্সিসকো থেকে রওনা হয়ে মিশরে এলাম—আমার শহর আবারিস-এ। ওখানে যেসব ফরাসি প্রত্নতত্ত্ববিদরা কাজ করছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে জানলাম, মমি এবং আংটি চলে গেছে কায়রোর একটা মিউজিয়ামে। কায়েরোয় গিয়ে জানলাম, জিনিসগুলো চলে গেছে প্যারিস-এর লুভ্‌র-এ। তারপর এলাম এখানে—প্রায় চার হাজার বছর পরে। আমার প্রিয় আত্মার মরদেহ ও দেবতা থোতের আংটির কাছে।

কিন্তু কীভাবে পৌঁছোব ওই মমির কাছে? মিউজিয়ামের অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে একটা চাকরি চাইলাম। মিশর সম্বন্ধে আমার জ্ঞান দেখে উনি বললেন যে, আমার উচিত মিশরতত্ত্বের অধ্যাপক হওয়া। যা হোক, পরে ইচ্ছে করে দু-একটা ভুলভাল জবাব দিয়ে এই সাধারণ কর্মচারীর কাজটা পেলাম। আর পেলাম এই ছোট্ট ঘরটা—আমার থাকার জায়গা, আমার যৎসামান্য জিনিসপত্র নিয়ে। এটাই আমার এখানে প্রথম ও শেষ রাত।

মিঃ স্মিথ, এই হল আমার কাহিনি। আপনি বুদ্ধিমান লোক, সব বোঝেন, সবই দেখলেন। আংটিটা খুঁজে পেয়েছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ক্রিস্টালের মধ্যে রাখা সেই ওষুধটা এখন আমার কাছে। আমি খুব শিগগির এই অভিশপ্ত সুস্থ জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে যাব। আমার আর কিছু বলার নেই। আমি আজ ভারমুক্ত হলাম। এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান—সোজা বড় রাস্তায় পড়বেন। শুভ রাত্রি!

স্মিথ বাইরে এসে ফিরে তাকালেন দরজার দিকে। চার হাজার বছর বয়সি মিশরীয় সোসরার চেহারা দরজার ফ্রেমে এক মুহূর্তের জন্যে দেখা গেল। তারপর বন্ধ হয়ে গেল দরজা। মধ্যরাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে শোনা গেল দরজায় খিল দেওয়ার আওয়াজ।

লন্ডনে ফিরে আসার পরের দিন স্মিথ 'টাইমস' কাগজে প্যারিসের প্রতিবেদকের পাঠানো একটা ছোট খবর দেখতে পেলেন। খবরটা এইরকম ঃ

লুভ্‌র মিউজিয়ামে রহস্যময় ঘটনা

গতকাল সকালে মিউজিয়ামের সাফাই কর্মচারীরা পূর্বদিকের একটা হলঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে দ্যাখে, মিউজিয়ামের একজন কর্মচারী একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মমির গলা জড়িয়ে ধরে মরে পড়ে আছে। মৃত ব্যক্তি মমিটাকে এত শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছিল যে সেই বজ্রবন্ধন ছাড়াতে বেশ অসুবিধা হয়। যে বাক্সে অমূল্য কয়েকটি আংটি রাখা ছিল, সেই বাক্সটা কেউ খুলেছিল এবং তন্নতন্ন করে তার ভেতরটা খুঁজেছিল। কর্তৃপক্ষের অনুমান, লোকটি মমিটা চুরি করে পুরাতত্ত্বের কোনও সংগ্রহকারীকে বিক্রি করে দেওয়ার মতলবে ছিল। কিন্তু হৃদযন্ত্রের পুরোনো কোনও অসুস্থতার কারণে হঠাৎ তার মৃত্যু হয়। বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় যে, লোকটির বয়স অনিশ্চিত এবং তার ধরন-ধারণ ছিল অস্বাভাবিক। তার এই নাটকীয় এবং আকস্মিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করার জন্য তার কোনও জীবিত আত্মীয় বা বন্ধুর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

'The Ring of Thoth' গল্পের অনুবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

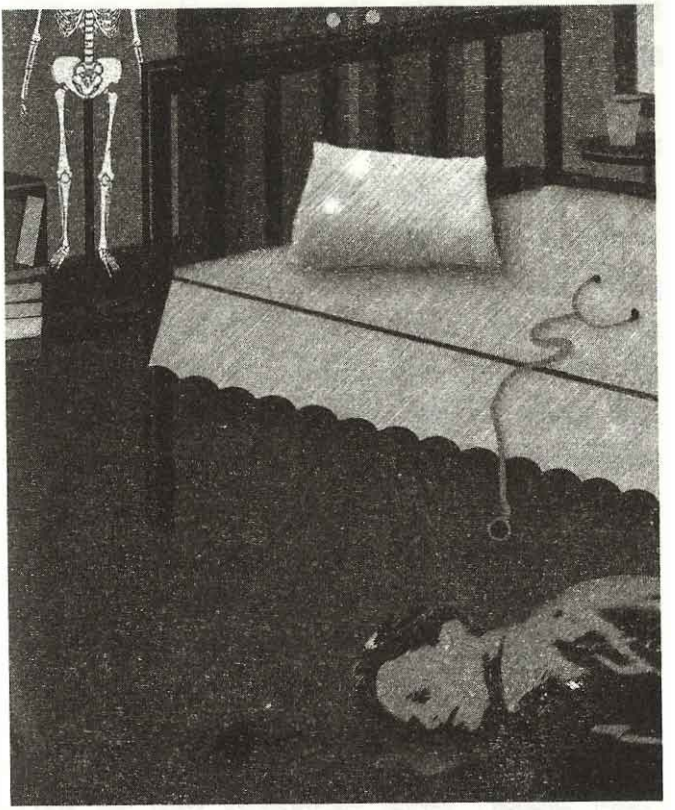

অন্তর্ধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিভারপুল শহর থেকে মাইল দশেক দূরে 'বিশপস্ ক্রসিং' নামে একটা ছোট গ্রামে এক ডাক্তার থাকতেন। তাঁর নাম ডাঃ অ্যালোইসিয়াস লানা। তিনি কেনই বা এই অখ্যাত গ্রামে এলেন বা তাঁর পূর্বপরিচয় কী—এ ব্যাপারে কেউ বিশেষ কিছু জানত না। কেবল এটা সবাই জানত যে তিনি গ্লাসগো শহর থেকে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে ডাক্তারি পাশ করেছিলেন। এও বোঝা যেত যে তিনি বিদেশি—সম্ভবত স্পেনের লোক। গায়ের রং প্রায় ভারতীয়দের মতো—ফ্যাকাশে ফরসা নয়। মাথার চুল কালো কুচকুচে। ঘন কালো ভ্রূ জোড়ার নীচে ঝকঝকে চোখে বুদ্ধির ছাপ। ব্যবহার ও চলাফেরায় যথেষ্ট আভিজাত্য। লোকে তাঁকে 'কালো ডাক্তার' বলে উল্লেখ করত—প্রথমদিকে কৌতুকে, পরে সম্মানের সঙ্গে।

ডাঃ লানা মেডিসিন এবং সার্জারি—দুটোতেই ছিলেন সমান পারদর্শী। এমনকী লিভারপুলের মতো বড় শহরের ডাক্তারদের থেকেও তাঁর খ্যাতি বেশি ছিল। লিভারপুলের এক লর্ড-এর ছেলেকে অস্ত্রোপচার করে সারিয়ে ডাঃ লানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ নাম করেছিলেন। আর তাঁর সুন্দর চেহারা ও বিনীত ব্যবহারের জন্যও সবাই তাঁকে পছন্দ করত। কেউ আর তাঁর বংশপরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাত না।

এত গুণের অধিকারী ডঃ লানার বিরুদ্ধে সবাইয়ের একটাই অভিযোগ ছিল—তিনি বিয়ে করছেন না কেন? ভালো পসারের জন্য প্রভূত অর্থের মালিক ডাঃ লানার বাড়িটা ছিল বিশাল। অনেকেই তাঁর বিয়ের সম্বন্ধে এনেছিলেন, কিন্তু ডাক্তার বিয়ের ব্যাপারে কোনও উৎসাহ দেখাননি। যাই হোক, সবাই যখন ধরেই নিয়েছে যে ডাক্তার-পাকাপাকিভাবে অবিবাহিত থাকবেন, তখনই হঠাৎ জানা গেল যে, 'লি হল' নামে একটা বাড়ির মেয়ে—মিস ফ্রান্সেস মর্টনের সঙ্গে ডাঃ লানার বিয়ে ঠিক হয়েছে।

ফ্রান্সেস-এর বাবা-মা দুজনের কেউই বেঁচে নেই। ও থাকে ভাই আর্থারের সঙ্গে। ওদের বিশাল সম্পত্তির দেখাশোনা করে আর্থারই। ফ্রান্সেসের চেহারার আভিজাত্য এবং ওর সংবেদনশীল স্বভাব দেখে ডাঃ লানা একটা পার্টিতে ওর সঙ্গে আলাপ করেন এবং তারপর কিছুদিন মেলামেশার পরে এই বিয়ের প্রস্তাব। ফেব্রুয়ারি মাসে ঠিক হল যে, অগাস্ট মাসে বিয়ে হবে। ডাক্তারের বয়স সাঁইত্রিশ ও ফ্রান্সেসের বয়স মাত্র চব্বিশ হলেও, সব মিলিয়ে ওদের জুড়িটা ভালোই হয়েছে বলে সবার ধারণা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩ জুন আর্জেন্টিনার বুয়েনস এয়ার্স থেকে ডাঃ লানার নামে একটা খামে ভরা চিঠি এল। খামের ওপর ঠিকানাটা কোনও পুরুষের হস্তাক্ষর বলেই মনে হল পোস্টমাস্টারের। এই প্রথম ডাঃ লানার নামে বিদেশ থেকে কোনও চিঠি এল।

পরের দিন, অর্থাৎ ৪ জুন ডাঃ লানা ফ্রান্সেসদের বাড়িতে গেলেন এবং মিস ফ্রান্সেসের সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর ডাক্তার বেশ উত্তেজিত অবস্থায় বাড়ি ফিরলেন। এদিকে মিস ফ্রান্সেসও সারাদিন আর নিজের ঘর থেকে বেরোল না। বাড়ির পরিচারিকা বেশ কয়েকবার ফ্রান্সেসকে চোখের জল ফেলতে দেখেছিল।

এক সপ্তাহের মধ্যেই গ্রামে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে ডাক্তার ও ফ্রান্সেসের বিয়ে হচ্ছে না। ডাক্তার নাকি ফ্রান্সেস-এর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন এবং ফ্রান্সেস-এর ভাই আর্থার ডাক্তারকে চাবুক দিয়ে মারবে বলে শাসিয়েছে।

ব্যাপারটা ঠিক কী হয়েছিল, তা কেউ বুঝতে পারছিল না। কিন্তু ওই দিনের পর থেকে ডাক্তার 'লি হল'-এর দিকের রাস্তায় যাওয়া বন্ধ করে দিলেন, এমনকী চার্চে যাওয়াও। অর্থাৎ, ডাক্তার ফ্রান্সেসকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতে লাগলেন। স্থানীয় খবরের কাগজে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন (বিজ্ঞাপনদাতার নাম ছিল না) থেকে অনেকেই অনুমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন যে ডাক্তার তাঁর প্র্যাকটিসটাও বিক্রি করে দিতে চাইছেন।

এরকম যখন পরিস্থিতি, তখন ২১ জুন সোমবার এমন একটা ঘটনা ঘটল যে পুরো ব্যাপারটা আর স্থানীয় গল্পগুজব কিংবা কানাঘুষোর পর্যায়ে রইল না। কী হয়েছিল, বলি।

ডাক্তারের বাড়িতে কাজ করতেন দুই মহিলা—মার্থা ও মেরি। প্রথমজন গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধান করতেন, আর মেরি ছিল কাজের মেয়ে। এ ছাড়া ছিল আরও দুজন—একজন কম্পাউন্ডার আর অন্যজন ঘোড়াগাড়ির চালক। দুজনেই থাকত বাড়ির কম্পাউন্ডের আউটহাউসে।

ডাক্তারের অপারেশনের ঘরের পাশেই ছিল তাঁর পড়ার ঘর। অনেক রাত অবধি ডাক্তার সেখানে পড়াশোনা করতেন। অপারেশনের ঘরের একটা দরজা ছিল বাইরের দিকে—এই দরজা দিয়ে কেউ যাওয়া আসা করলে বাড়ির লোকে কেউ কিছু জানতে পারত না। অনেক সময় রাতের দিকে কোনও রোগী এলে তারা বাড়ির প্রধান দরজায় না গিয়ে এই দরজা দিয়েই ডাক্তারের কাছে যেত।

২১ জুন রাত সাড়ে ন'টার সময় মার্থা ডাক্তারের পড়ার ঘরে গিয়ে দেখেন, ডাক্তার পড়াশোনায় ব্যস্ত। মার্থা তখন ডাক্তারকে শুভরাত্রি জানিয়ে মেরিকেও শুয়ে পড়তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেন। তারপর মার্থা রাত পৌনে এগারোটা পর্যন্ত বাড়ির টুকিটাকি কাজে ব্যস্ত থাকেন। হলঘরের ঘড়িটায় যখন এগারোটা বাজছে, তখন মার্থা নিজের ঘরে যান। তার পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে বাড়ির মধ্য থেকে একটা তীব্র চিৎকারের আওয়াজ তাঁর কানে আসে। তক্ষুনি ড্রেসিং গাউন পরে মার্থা দৌড়ে যান ডাক্তারের পড়ার ঘরের দিকে। ঘরের দরজায় তিনি টোকা দিলে ভেতর থেকে আওয়াজ আসে—কে?

—স্যর, আমি মার্থা।

—আপনি এই মুহূর্তে নিজের ঘরে চলে যান। আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন।

কথাগুলো কর্কশ লাগলেও এবং এই ধরনের কথা বলা ডাক্তারের স্বভাব বিরুদ্ধ হলেও, মার্থার ধারণা কথাগুলো ডাক্তারেরই এবং গলার আওয়াজও তাঁর। যাই হোক, সাড়ে এগারোটা নাগাদ মার্থা নিজের ঘরে ফিরে যান।

রাত এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে কোনও সময়ে ডাঃ লানার সঙ্গে দেখা করতে আসেন মিসেস ম্যাডিং। তাঁর স্বামী টাইফয়েড-এ ভুগছিলেন, এবং ডাক্তার বলেছিলেন রাতের দিকে রোগীর অবস্থাটা তাঁকে জানিয়ে যেতে।

মিসেস ম্যাডিং দেখেন ডাক্তারের ঘরে আলো জ্বলছে। কিন্তু বেশ কয়েকবার দরজায় ধাক্কা দিয়েও ডাক্তারের সাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না পেয়ে তিনি ভাবলেন যে ডাক্তার হয়তো কোথাও বেরিয়েছেন। অগত্যা মিসেস ম্যাডিং নিজের বাড়ির দিকে পা বাড়ান। কম্পাউন্ডের ভেতর থেকে গেটের কাছে যাওয়ার সময় গেটের আলোয় তিনি একজন লোককে আসতে দেখেন। প্রথমে মনে হয়েছিল, হয়তো ডাক্তারই ফিরে আসছেন। কিন্তু মিসেস ম্যাডিং কিছুটা অবাক হয়েই দেখেন যে আগন্তুক আর কেউ নন, ফ্রান্সেস মর্টনের দাদা আর্থার মর্টন। আর্থারের হাবভাবে উত্তেজনা, হাতে একটা চাবুক।

ডাক্তার বাড়িতে নেই, এ কথা বলার পরও আর্থার বেশ কড়াভাবে বলল,—ঘরে যখন আলো জ্বলছে, কখনও না কখনও তো ডাক্তার ফিরবেনই।

এই বলে আর্থার বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকে গেল আর মিসেস ম্যাডিং চলে গেলেন নিজের বাড়ির দিকে।

রাত তিনটে নাগাদ অসুস্থ মিঃ ম্যাডিং-এর অবস্থার দ্রুত অবনতি হল। মিসেস ম্যাডিং তক্ষুনি আবার ডাক্তারের বাড়িতে যান। বাড়ির কম্পাউন্ডে ঝোপের আড়ালে একটা লোককে তিনি দেখতে পান। মিসেস ম্যাডিং-এর ধারণা, লোকটা আর্থার মর্টন। যাই হোক, এ ব্যাপারে আর মাথা না ঘামিয়ে বাড়ির কাছে গিয়ে তিনি দেখতে পান, পড়ার ঘরের সেই আলোটা একইরকম উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজায় বহুবার করাঘাত করেও এবং জানালায় টোকা দিয়েও ডাক্তারের সাড়া পাওয়া গেল না। তখন বাধ্য হয়েই জানলার কাঠের ফ্রেম ও পরদার মধ্যে এক জায়গায় একটু ফাঁক পেয়ে ঘরের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলেন মিসেস ম্যাডিং।

ঘরের মাঝখানে একটা বড় বাতি জ্বলছে। টেবিলের ওপর ডাক্তারের বইপত্র, যন্ত্রপাতি ছড়ানো। প্রথমে মনে হল, ঘরের মেঝের ওপর একটা ময়লা সাদা দস্তানা পড়ে আছে। কিন্তু আলোয় চোখটা একটু সয়ে যেতেই মিসেস ম্যাডিং বুঝতে পারলেন যে দস্তানাটা আসলে একটা মানুষের হাত আর মানুষটা মেঝের ওপর নিঃসাড়ভাবে পড়ে আছে।

সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে এটা বুঝতে পেরে তিনি তখন বাড়ির সামনের দরজায় গিয়ে বেল বাজিয়ে মার্থাকে ডাকলেন। তারপর মার্থা ও তিনি ঢুকলেন ওই পড়ার ঘরে। আর মেরিকে পাঠানো হল পুলিশে খবর দিতে।

টেবিলের পাশেই, জানলার থেকে একটু দূরে ডাঃ লানা চিত হয়ে পড়ে আছেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি মৃত। মুখে ও ঘাড়ে কালশিটে পড়া আঘাতের চিহ্ন। একটা চোখের ওপরেও আঘাত লেগেছে মনে হল। মুখচোখের ফোলাভাব দেখে মনে হয়, ডাক্তারকে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তারের পরনে তাঁর ডাক্তারি অ্যাপ্রন, পায়ে কাপড়ের চটি। চটিজোড়া কিন্তু পরিষ্কার, তাতে কোনও ময়লা লেগে নেই। অথচ কার্পেটের ওপর কাদামাখা বুটজোড়ার ছাপ—হয়তো খুনির বুট জোড়ারই।

সবকিছু দেখে শুনে পুলিশ এই সিদ্ধান্তে এল যে অপারেশনের ঘরের দরজা দিয়েই খুনি ঘরে ঢুকেছিল, এবং কাজ সেরে লুকিয়ে পালিয়ে গেছে। আঘাতের প্রকৃতি ও জুতোর ছাপ দেখে মনে হয়, খুনি পুরুষ।

ঘরের ভেতর থেকে কোনও কিছু চুরি যায়নি—এমনকী ডাক্তারের সোনার ঘড়িটাও তাঁর পকেটে আছে। ফ্রান্সেস মর্টনের একটা ছবি থাকত এই ঘরে—মার্থা দেখলেন, ছবিটা নেই। মেঝের ওপর সবুজ রঙের একটা চোখ-ঢাকা-দেওয়ার প্যাচ পড়ে আছে। এটা অবশ্য ডাক্তারেরই জিনিস হতে পারে, যদিও মার্থা আগে কখনও এটা দ্যাখেননি।

সমস্ত সন্দেহ গিয়ে পড়ল একজনেরই ওপর—আর্থার মর্টন। এবং পুলিশ তকে গ্রেফতার করল। আর্থারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও আনুষঙ্গিক প্রমাণ সাংঘাতিক। বোনের সঙ্গে ডাঃ লানা বিচ্ছেদ হওয়ার পর আর্থারের প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি অনেকেই শুনেছে। পুলিশের অনুমান, চাবুক হাতে রাত এগারোটায় আর্থার ডাক্তারের ঘরে ঢোকে। সেই সময় ভয়ে বা রাগে ডাক্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেঁচিয়ে ওঠেন, মার্থা সেই চিৎকার শুনেছেন। তারপর আর্থার ও ডাক্তারের মধ্যে বাদ্‌বিতণ্ডা এমন পর্যায় পৌঁছয় যে, আর্থারের আঘাতে ডাক্তারের মৃত্যু হয়।

ময়না তদন্তের রিপোর্টে জানা যায় যে, ডাক্তারের হার্টের রোগ ছিল—সেটা অবশ্য তাঁর পরিচিতরা কেউ জানত না। হয়তো দুর্বল হার্টের জন্যই তাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়েছে। তার পরেই আর্থার বোনের ছবিটা ফ্রেম থেকে ছিঁড়ে নিয়ে কম্পাউন্ডের ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে লুকিয়ে বাড়ি চলে যায়। সরকার পক্ষের উকিল এই ঘটনাচক্রের ভিত্তিতেই তাঁর বক্তব্য রাখলেন।

অবশ্য আর্থারের স্বপক্ষেও কিছু তথ্য ছিল। একটু গোঁয়ার ভাব থাকলেও ওর সরলতা ও দিলখোলা স্বভাবের জন্য সবাই ওকে ভালোবাসত। ও পুলিশকে শুধু এটুকুই বলেছিল যে, ডাক্তারের সঙ্গে পারিবারিক কিছু ব্যাপারে কথা বলার জন্যই ও ডাক্তারের বাড়ি গিয়েছিল। নিজের বয়ানে বা পুলিশের জেরার উত্তরে ও কিন্তু কখনও নিজের বোনের সম্বন্ধে কোনও কথা বলেনি। যাই হোক, ডাক্তারকে না পেয়ে কম্পাউন্ডে অপেক্ষা করে করে শেষে রাত তিনটের সময় ও বাড়ি ফিরে যায়। ডাক্তারের মৃত্যুর ব্যাপারে ও কিছুই জানত না।

সত্যিই কিছু তথ্য আর্থারের নির্দোষিতা প্রমাণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাঃ লানা রাত এগারোটার সময় তাঁর পড়ার ঘরে ছিলেন—জীবিত, কেন না মার্থা ওই সময় ডাক্তারের গলার আওয়াজ শুনেছিলেন। হতে পারে, তখন ডাক্তারের সঙ্গে অন্য কেউ ছিল। যেভাবে ডাক্তার অধৈর্যের সঙ্গে মার্থাকে ওই সময় চলে যেতে বলেন, তাতে তাই মনে হয়। এই যুক্তি যদি সত্যি হয়, তাহলে ডাক্তারের মৃত্যু হয়েছিল এই দুই ঘটনার মধ্যে কোনও সময়ে—তাঁর গলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া এবং মিসেস ম্যাডিং-এর ডাক্তারের বাড়ি আসা। সে ক্ষেত্রে আর্থার নির্দোষ, কেন না মিসেস ম্যাডিং আর্থারকে দেখেন এর পরে, গেটের কাছে।

এবার প্রশ্ন, ডাক্তার লানার ঘরে তাহলে কে এসেছিল এবং কী উদ্দেশ্যে। আর্থারকে ছাড়া বাড়ির ত্রিসীমানায় আর কাউকে দেখা যায়নি। তা ছাড়া, ডাক্তারের প্রতি তার বিরূপ মনোভাব ছিল সুবিদিত। কাদামাখা জুতোর ছাপ দেখেও কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। সেদিন বৃষ্টি হওয়ায় যে কেউই ডাক্তারের ঘরে এসে থাকুক, তার জুতোর ছাপ কাদামাখাই হত। ফ্রান্সেসের ছবিটা আর্থারের কাছে না পাওয়া গেলেও তার মানে এই নয় যে, আর্থার নির্দোষ—কেন না ছবিটা সরিয়ে ফেলার বা নষ্ট করার যথেষ্ট সময় আর্থারের হাতে ছিল। সব মিলিয়ে এটা কিছুতেই বোঝা যাচ্ছিল না যে আর্থার দোষী না নির্দোষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহস্যময় এবং বিয়োগাত্মক ঘটনাটির এই হল সংক্ষিপ্তসার। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং আয়ার্ল্যান্ডে লোকজন এই রহস্য নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছিল। সমাধানের বিভিন্নরকম সূত্রও দিয়েছিল। কিন্তু আদালতে বিচারের সময় যে চাঞ্চল্যকর পরিণতির ইঙ্গিত পাওয়া গেল, তার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। তখনকার "ল্যাংকাশায়ার উইক্‌লি" নামের খবরের কাগজে এই বিচারের যে রিপোর্ট বেরিয়েছিল, তারই একটা সংক্ষিপ্তসার এখানে দেওয়া যায়।

সরকার পক্ষের উকিল মিঃ কার আর্থারের বিরুদ্ধে এমনভাবে কেস সাজিয়েছিলেন যে আর্থারের উকিল মিঃ হামফ্রি প্রায় অসহায় হয়ে পড়লেন। বেশ কয়েকজন সাক্ষী জানাল যে, বোনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্য ডাক্তারের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনা তারা আর্থারের মুখে শুনেছে। মিসেস ম্যাডিং বললেন যে, তিনি আর্থারকে ওই রাতে ডাক্তারের বাড়ির কম্পাউন্ডে দেখেছেন। আরেকজন সাক্ষী বলল যে, আর্থার ভালোভাবেই জানত যে ডাঃ লানা অনেক রাত অবধি মূল নিবাস থেকে বিচ্ছিন্ন তাঁর চেম্বারে কাজ করেন এবং সেই জন্যই সে অত রাতে এসেছিল। ডাক্তারের এক চাকর তো মিঃ কারের জেরায় নাজেহাল হয়ে বলেই ফেলল যে ডাক্তার রাত তিনটের সময় বাড়ি ফিরেছিলেন। সুতরাং, মিসেস ম্যাডিং যেহেতু রাত তিনটের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় আর্থারকে দেখেছিলেন, ব্যাপারটা দুয়ে দুয়ে চার হয়ে গেল।

এমনকী ডাক্তারের ঘরে পাওয়া জুতোর ছাপের সঙ্গে আর্থারের জুতোর ছাপের মিল সরকার পক্ষ প্রায় প্রমাণ করে দিল।

বেলা তিনটের সময় যখন মিঃ কার তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন এবং আদালত দ্বিপ্রাহরিক বিরতির জন্য বন্ধ রইল, তখন উপস্থিত সবাই এটা বুঝে গেল যে, আর্থারকে নির্দোষ প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব।

সাড়ে চারটের সময় আবার আদালত চালু হতেই বেশ হই-হট্টগোল শুরু হয়ে গেল, কেন না আর্থারের উকিল পেশ করলেন তাঁর প্রথম সাক্ষীকে—মিস ফ্রান্সেস মর্টন। ফ্রান্সেসকে একটু বিচলিত দেখালেও সে কিন্তু নীচু গলায় অথচ পরিষ্কারভাবে সাক্ষ্য দিল।

ও বলল, ডাক্তারের সঙ্গে ওর সম্পর্কের শীঘ্রই ছাড়াছাড়ি হতে চলেছে। ওর ভাই আর্থার ডাক্তার সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য করেছে, সেগুলো অনুচিত, কেন না ডাঃ লানা অত্যন্ত সজ্জন এবং তিনি ফ্রান্সেস-এর সঙ্গে কোনওরকম দুর্ব্যবহার করেননি। আর্থারকে প্রচুর বোঝানো সত্ত্বেও ফ্রান্সেস ওকে শান্ত করতে পারেনি। এমনকী ঘটনার দিন সন্ধেবেলায় "ওই ডাক্তারকে আমি দেখে নেব" বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্থার শাসিয়েছিলেন।

ফ্রান্সেস-এর বক্তব্য এখনও পর্যন্ত আর্থারের বিরুদ্ধেই যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎই আর্থারের উকিল মিঃ হামফ্রি ব্যাপারটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন।

মিঃ হামফ্রি ঃ আচ্ছা, ফ্রান্সেস, তোমার কি বিশ্বাস তোমার ভাই অপরাধী?

জজ ঃ আদালতে বিশ্বাসের কোনও জায়গা নেই—প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করুন।

মিঃ হা ঃ তুমি কি জানো তোমার ভাই ডাঃ লানাকে খুনের অপরাধে অভিযুক্ত নয়?

ফ্রান্সেস ঃ জানি।

মিঃ হা ঃ কীভাবে?

ফ্রা ঃ কেন না ডাঃ লানা মারা যাননি।

এই চাঞ্চল্যকর উক্তিতে আদালতে বেশ গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। একটু পরে আবার শুরু হল সওয়াল জবাব।

মিঃ হা ঃ ফ্রান্সেস, তুমি কী করে জানলে যে ডাঃ লানা মারা যাননি?

ফ্রা ঃ কেন না তাঁর তথাকথিত মৃত্যুর তারিখের পরে লেখা তাঁর চিঠি আমি পেয়েছি।

মিঃ হা ঃ চিঠিটা তোমার কাছে আছে?

ফ্রা ঃ আছে, কিন্তু সেটা আমি দেখাতে চাই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিঃ হা ঃ খামটা?

ফ্রা ঃ হ্যাঁ—এই যে খামটা। লিভারপুল পোস্ট অফিসের ছাপ—তারিখ ২২ জুন।

মিঃ হা ঃ তার মানে, তাঁর তথাকথিত মৃত্যুর পরের দিন। তুমি শপথ করে বলতে পারো—এই হাতের লেখা ডাঃ লানার?

ফ্রা ঃ অবশ্যই। আমি আরও ছ'জন লোককে আনতে পারি যারা এই হাতের লেখা চেনে।

জজ ঃ মিঃ হামফ্রি, তাহলে আপনি সেই সাক্ষীদের কাল কোর্টে আসতে বলুন।

সরকার পক্ষের উকিল মিঃ কার তখন বললেন,—চিঠিটা আমাদের দেওয়া হোক, যাতে বিশেষজ্ঞ দিয়ে আমরা পরীক্ষা করাতে পারি হাতের লেখাটা সত্যিই ডাঃ লানার না নকল। এই চিঠিটা যখন মিস ফ্রান্সেস মর্টনের কাছেই ছিল, তাহলে সেটা উনি আগেই পুলিসকে দিলেন না কেন? তাহলে মামলাটা এতদূর গড়াত না। হয়তো অভিযুক্তকে বাঁচানোর জন্য শেষ মুহূর্তে এই নকল চিঠিটা দেখিয়ে আদালতের রায় বদলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

মিঃ হা ঃ ফ্রান্সেস, এই ব্যাপারে তোমার কি কোনও বক্তব্য আছে?

ফ্রা ঃ ডাঃ লানা চিঠির ব্যাপারটা গোপন রাখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছিলেন।

মিঃ কার ঃ তাহলে তুমি এখন এই চিঠিটা পেশ করলে কেন?

ফ্রা ঃ আমার ভাইকে বাঁচানোর জন্য।

জজ ঃ ঠিক আছে। আপাতত আদালত মুলতুবি রইল। আগামীকাল আবার শুনানি হবে। মিঃ হামফ্রিকে প্রমাণ করতে হবে মৃত মানুষটির দেহটা কার।

রহস্যের এই আকস্মিক মোচড় নিয়ে খবরের কাগজে প্রচুর লেখালেখি হয়। যদি সত্যিই প্রমাণ হয় যে ডাঃ লানা জীবিত, তাহলে সেই অপরিচিত লোকটির মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী। হয়তো তাঁর চিঠিতে এই ব্যাপারে স্বীকারোক্তি আছে। অর্থাৎ, ফ্রান্সেস যদি তার ভাইকে বাঁচাতে চায়, তাহলে ডাঃ লানাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে হবে—কেন না হত্যার শাস্তি মৃত্যু।

পরের দিন সকালে আদালত লোকজনে ভরতি। মিঃ হামফ্রির হাবভাব বেশ বিচলিত। উনি সরকার পক্ষের উকিল মিঃ কারের কানে কানে কিছু বললেন। তা শুনে মিঃ কারের মুখ চোখের চেহারা পালটে গেল। এর পর মিঃ হামফ্রি জজসাহেবকে বললেন যে, তিনি ফ্রান্সেসকে সাক্ষী দিতে আর ডাকছেন না এবং এ-ব্যাপারে মিঃ কারের কোনও আপত্তি নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জজ ঃ তাহলে কিন্তু, মিঃ হামফ্রি, এই রহস্যের সমাধান করা মুশকিল হয়ে পড়বে।

মিঃ হা ঃ আমি অন্য একজন সাক্ষীকে পেশ করছি, যার সাক্ষে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

জজ ঃ ঠিক আছে। তাহলে ডাকুন আপনার সাক্ষীকে।

মিঃ হা ঃ সাক্ষী ডাঃ অ্যালোইসিয়াস লানাকে ডাকা হোক।

বলা বাহুল্য, বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল পুরো আদালত এবং সমবেত লোকজন।

যে ডাক্তারকে নিয়ে এত আলোচনা এবং যার মৃত্যু নিয়ে এই বিচার, তাকে আদালতে সশরীরে দেখতে পেয়ে সবাই বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। যারা ডাঃ লানাকে আগে দেখেছে, তাদের মনে হল ডাক্তারের চেহারা যেন একটু শুকিয়ে গেছে, মুখে বিষণ্ণতার ছাপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতা ও আভিজাত্য একটুও কমেনি। জজসাহেব অনুমতি দিলে ডাঃ লানা তাঁর বিবৃতি শুরু করলেন ঃ

২১ জুন রাতে যা ঘটেছিল, তা আমি সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে বলব। যদি আগেই জানতে পারতাম যে এই ঘটনার জন্য নিরপাধ কেউ শাস্তি পেতে চলেছে, তাহলে আরও আগেই আমার বক্তব্য জানাতাম কিন্তু আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেও জানতাম না জল এতদূর গড়িয়েছে। যাই হোক, আমার দ্বারা যেটুকু ভুলভ্রান্তি হয়েছে, সেটাও আমি ঠিক করার চেষ্টা করছি।

আর্জেন্টিনা সম্বন্ধে যারা জানেন, তাঁদের কাছে লানা পরিবারের নাম সুবিদিত। প্রাচীন স্পেনের এক অভিজাত বংশের লোক আমরা। আমার বাবা আর্জেন্টিনা উচ্চ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দাঙ্গায় তাঁর মৃত্যু না হলে হয়তো আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতিও হয়ে যেতেন। আমি আর আর্নেস্ট ছিলাম দুই যমজ ভাই। আমাদের দুজনকে অবিকল একরকম দেখতে ছিল। লোকে প্রায়ই বুঝে উঠতে পারত না—কে আর্নেস্ট আর কে অ্যালোইসিয়াস। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গি বা মুখের অভিব্যক্তি একটু আলাদা হতে থাকলেও আমাদের শারীরিক মিল ছিল একইরকম।

মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে কোনও বিরূপ মন্তব্য করা ঠিক নয়, আর বিশেষত সেই ব্যক্তি যদি নিজের ভাই হয়। তবুও আপনাদের এটুকু জানা দরকার যে, আমার ভাই মোটেই ভালো মানুষ ছিল না। ওকে আমি রীতিমতো ভয় পেতাম, কেন না ওর অনেক অপকর্মের দায় আমাকে বহন করতে হয়েছিল আমাদের চেহারার সাদৃশ্যের জন্য।

অবশেষে একটা অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপারে যখন ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃতকর্মের পুরো দায়টাই আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল, তখন আমি জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে চিরদিনের মতো ইউরোপে চলে এলাম। গ্লাসগো থেকে ডাক্তারি পাশ করে এই অঞ্চলে প্র্যাকটিস শুরু করে দিলাম। ভেবেছিলাম, ল্যাংকাশায়ারের এই প্রত্যন্ত গ্রামে আর্নেস্টের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।

কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, এত বছর পরেও ও আমার খোঁজ পেয়ে গেল। ওর টাকাকড়ি কিছু নেই, পুরোপুরি নিঃস্ব। একটা চিঠি লিখে আমাকে জানাল, ও আসছে। ও জানত, আমি ওকে ভয় পাই। তাই ওর মতলব, আমাকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা। আমি বুঝতে পারলাম, আর্নেস্টের আগমন যথেষ্ট বিপজ্জনক, এবং সেটা শুধু আমার কাছে নয়, আমার পরিচিত ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছেও।

যাই হোক, ওই দিন রাত দশটা নাগাদ, আমার ভাই এসে হাজির হল। জানলার কাচের বাইরে ওর মুখটা দেখে প্রথমে চমকে উঠেছিলাম—এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল ওটা আমারই প্রতিচ্ছবি। এত মিল আমাদের দুজনের। চোখে পড়ল, ওর ঠোঁটের কোণে সেই পুরোনো বদমায়েসি হাসি। এই আমার সেই ভাই, যার জন্য আমি দেশছাড়া। মাথা ঠান্ডা রেখে দরজা খুলে দিলাম। ও ভেতরে এল।

দেখেই বুঝলাম ওর অবস্থা খুব খারাপ। হতদরিদ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থায় লিভারপুল থেকে হেঁটে হেঁটে এখানে এসেছে। জাহাজে নাবিকদের সঙ্গে হয়তো মারপিট করেছিল। একটা চোখে আঘাত লেগেছে—সেই চোখের ওপর একটা প্যাচ লাগানো। কিন্তু আমার ডাক্তারি চোখে বুঝতে পারলাম যে ওর শরীরে সম্ভবত কোনও সাংঘাতিক ব্যাধিও আছে।

ও আমাকে কেমনভাবে অপমান করল বা কীসের ভয় দেখাল, সে বিষয়ে এখানে আর কিছু বলতে চাই না। কিন্তু এটুকু বলা দরকার যে ওর চরম দুর্ব্যবহার ও গালিগালাজ সত্ত্বেও আমার মাথা ঠান্ডা রেখেছিলাম। বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে ওর দারিদ্র্য ওকে আমার প্রতি এমন বিদ্বেষপূর্ণ করে তুলেছে—কেন না আমি প্রভূত বিত্তের মালিক।

চেঁচামেচি করে ঘুষি পাকিয়ে আমার দিকে হঠাৎ একবার এগিয়ে আসার সময় ও হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে বুকের একপাশ চেপে ধরে একটা চিৎকার করে ধড়াস করে মেঝের ওপর পড়ে গেল। ওকে তুলে ধরে সোফাতে শোওয়ালাম। কোনও সাড়াশব্দ নেই মুখে, হাত ঠান্ডা। ওর বদমেজাজ ও অসুস্থ হার্ট—দু'য়ে মিলে ওর মৃত্যু হয়েছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। পুরো ব্যাপারটা একটা সাংঘাতিক দুঃস্বপ্নের মতো লাগছিল। আর্নেস্টের শেষ চিৎকারটা শুনে মার্থা দরজায় করাঘাত করেছিলেন—তাঁকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি চলে যেতে বলেছিলাম। তারপরে আমার চেম্বারের দরজায় টোকা দিয়েছিল কেউ—সম্ভবত কোনও রোগী। আমি দরজা খুললাম না। বসে বসে বিশেষ কোনও চিন্তা ছাড়াই মাথায় হঠাৎ একটা প্ল্যান এসে গেল।

আপনারা জানেন, বিশপস্ ক্রসিং-এ থাকা আমার পক্ষে ব্যক্তিগত কারণে একটু অসুবিধাজনক হয়ে পড়ছিল। বিশেষত ফ্রান্সেস-এর সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার ব্যাপারটা ভেঙে যাওয়াতে আমি লোকের সহানুভূতির বদলে খারাপ ব্যবহারই পেয়েছিলাম। আর্নেস্টের মৃতদেহ দেখে আমার মনে হল, বিশপস্ ক্রসিং থেকে চিরতরে চলে যাওয়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ এখন আমার হাতে।

শরীরটা আমার থেকে একটু বেশি ভারী ও মুখে একটা কর্কশভাব—এ ছাড়া আমার আর আর্নেস্টের মধ্যে কোনও শারীরিক তফাত নেই। এমনকী দুজনেরই দাড়িগোঁফ কামানো। মাথার চুলও প্রায় একই দৈর্ঘের। যদি ওর সঙ্গে আমার পোশাকটা বদলে নিই, তাহলে সবাই ভাববে, ডাঃ লানা মারা গেছে।

প্ল্যানমতো এক ঘণ্টার মধ্যে ভাইয়ের সঙ্গে আমার পোশাক বদল করে বাড়িতে যা টাকাকড়ি ছিল তা সঙ্গে নিয়ে আমার চেম্বারের বাইরের দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম—সঙ্গে ছিল একজনের একটা ছবি। ভুল করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলে এসেছিলাম খালি একটা জিনিস—ভাইয়ের চোখের ওপর লাগানো সেই প্যাচটা। সেই রাতেই পৌঁছে গেলাম লিভারপুল।

জজসাহেব, আমি শপথ করে বলতে পারি যে আমি কখনও ভাবিনি যে লোকে বুঝবে আমাকে খুন করা হয়েছে, এবং সেইজন্য কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। বরং আমি ভেবেছিলাম এখান থেকে চলে গেলে কিছু লোক আর আমাকে দেখে বিব্রিত বোধ করবেন না।

কোনও দূর দেশে চলে যাওয়ার আগে কিছুদিনের জন্য জাহাজ ভ্রমণে যাব এই ভেবে লিভারপুলে একটা জাহাজের টিকিট কেটে ফেললাম। কিন্তু জাহাজে ওঠার আগে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। মর্টন পরিবারের আর সবাই আমার সঙ্গে যেরকম ব্যবহারই করে থাকুন না কেন, আমি জানতাম আমার মৃত্যু সংবাদে ফ্রান্সেস খুবই কষ্ট পাবে। তাই ফ্রান্সেসকে সবকিছু জানিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। চিঠিটার কথা আদালতে জানিয়ে ফ্রান্সেস ভালোই করেছে—না হলে নিরপরাধ আর্থার হয়তো শাস্তি পেত। যদিও আমি ওকে চিঠির ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলেছিলাম।

গতরাতেই জাহাজ ভ্রমণে শেষ করে লিভারপুলে ফিরেছি। আমার তথাকথিত মৃত্যু নিয়ে জল কতদূর গড়িয়েছে অথবা আর্থার মর্টন আমাকে হত্যার ব্যাপারে অভিযুক্ত হয়েছে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব আমি কিছুই জানতাম না। গতকাল সন্ধের কাগজে 'আইন-আদালত' সংক্রান্ত পাতায় খবরটা পড়েই একটা এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে এখানে চলে এসেছি—আদালতকে সত্যিটুকু বলব বলে।

বলা বাহুল্য, ডাঃ লানার এই বিবৃতির পরে মামলা খারিজ হয়ে গেল। তবুও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য পুলিশ আরও খোঁজখবর নিল। যেমন, যে জাহাজে ডাঃ লানার ভাই আর্জেন্টিনা থেকে ইংল্যান্ডে এসেছিল, সেই জাহাজের ডাক্তার পুলিশকে জানালেন যে, আর্নেস্টের হৃদরোগের ব্যাপারটা জাহাজেই ধরা পড়েছিল এবং পোস্ট মর্টেম রিপোর্টেও ওর মৃত্যুর কারণ হৃদরোগ।

ডাঃ লানা আবার থাকতে শুরু করলেন তাঁর হঠাৎ ছেড়ে যাওয়া বিশপস্ ক্রসিং-এই। আর্থার বুঝতে পারল, কি কারণে ডাক্তারের সঙ্গে তার বোন ফ্রান্সেস-এর ছড়াছড়ি হয়ে গিয়েছিল। ওর সঙ্গে ডাক্তারের পুরোনো সহজ সম্পর্ক আবার গড়ে উঠল।

এর কিছুদিন পরে 'মর্নিং পোস্ট' কাগজে 'ব্যক্তিগত' কলমে নিম্নোক্ত খবর অনেকেরই চোখে পড়েছিল ঃ

"গত ১৯ সেপ্টেম্বর বিশপস্ ক্রসিং চার্চে রেভারেন্ড স্টিফেন জনসন-এর পৌরোহিত্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্জেন্টিনার প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী ডন অ্যালফ্রেডো লানার পুত্র অ্যালোইশিয়াস জেভিয়ার লানার সঙ্গে লি হল নিবাসী স্বর্গীয় জেমস্ মর্টনের একমাত্র কন্যা ফ্রান্সেস মর্টনের শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হয়।"

'The Block Doctor' গল্পের অনুবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনাটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরলোকগত আত্মার সঙ্গে প্ল্যানচেটের মাধ্যমে যোগাযোগ করার সময় এই ঘটনাটি শুনেছিলাম। প্ল্যানচেটের মিডিয়ম যে ভাবে ঘটনাটি বলে গেছল, হুবহু সেইভাবে বর্ণনা করছি ঃ

সেদিন রাতের কিছু ঘটনা আমার পরিষ্কার মনে আছে, আবার কিছু ঘটনা যেন অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো। তাই ঠিক কী হয়েছিল, তা গুছিয়ে বলা বেশ কঠিন। যেমন, কেন সেদিন লন্ডনে গিয়েছিলাম আর কেনই বা অত রাতে লন্ডন থেকে ফিরছিলাম, তা ঠিক মনে পড়ছে না। লন্ডনে আগে যতবার গেছি, সেদিনের লন্ডন যাত্রাটাও যেন সেগুলোর সঙ্গে মিশে তালগোল পাকিয়ে গেছে। তবে রাতে সেই ছোট্ট গ্রামের স্টেশনে নামার পর থেকে সবকিছু আমার স্পষ্ট মনে আছে—প্রতিটি মুহূর্ত।

ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্ম ধরে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের ঘড়িতে দেখলাম রাত সাড়ে এগারোটা বাজে। ভাবলাম, বাড়ি যেতে যেতে হয়তো রাত বারোটা বেজে যাবে। স্টেশনের বাইরে এসে দেখলাম বড় মোটর গাড়িটা আমার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপেক্ষা করছে। ঝকঝকে পেতলের পার্টস আর জোরালো হেডলাইটের জন্য অন্ধকারের মধ্যেও গাড়িটা সহজেই চোখে পড়ল। গাড়িটার ডেলিভারি পেয়েছি সেই দিনই। ত্রিশ অশ্বশক্তির ইঞ্জিনওয়ালা রোবার গাড়ি। আমার ড্রাইভার পার্কিনস্‌কে জিগ্যেস করলাম,—গাড়িটা কেমন চলছে?

ও বলল,—ভীষণ ভালো।

—আমি একটু চালিয়ে দেখব? এই বলে আমি ড্রাইভারের আসনে বসে পড়লাম।

—স্যর, এই গাড়ির গিয়ারগুলো একটু অন্য ধরনের। এই রাতে আর আপনাকে চালাতে হবে না। আমিই চালাই। বলল পার্কিনস্‌।

—না-না! আমিই চালাব। এই বলে গাড়ি স্টার্ট করে দিলাম। আমার বাড়ি স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল দূরে।

গিয়ার বদলানোর পদ্ধতিটা একটু অন্যরকমের হলেও আমার ব্যাপারটা কঠিন বলে মনে হল না। রাতের অন্ধকারে নতুন গাড়ি নিয়ে এইরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাটা যদিও সম্পূর্ণ বোকামি, তবু মনে হল, মাঝে মাঝে এইরকম বোকামি করলে ক্ষতি কী। তা ছাড়া, সব নির্বুদ্ধিতারই তো আর ফল খারাপ হয় না।

ক্লেস্টাল হিল পর্যন্ত ভালোই চালালাম। কিন্তু এর পরের দেড়মাইল রাস্তার বদনাম আছে সারা দেশে—শুধু চড়াইটা খাড়া বলে নয়, তিনটে বিপজ্জনক বাঁকও আছে। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাহাড়টা পেরোলেই আমার বাড়ি।

পাহাড়টার মাথা থেকে নীচে নামার সময় সমস্যা শুরু হল। বেশ দ্রুত গতিতে চলছিল গাড়িটা। হঠাৎ ভাবলাম, গিয়ারে না দিয়ে গাড়িটা নিউট্রালে উৎরাইয়ের রাস্তা দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাব। কিন্তু গাড়িটাকে নিউট্রালে আনা গেল না। শুধু তাই নয়, গাড়িটা টপ গিয়ারেই ফেঁসে রইল। উৎরাইয়ের রাস্তায় ঝড়ের বেগে নামছে গাড়ি, বাঁকগুলো আসবে একে একে।

সুতরাং গাড়িটা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ব্রেক কষলাম—কিন্তু ব্রেক লাগল না। তাতেও ঘাবড়াইনি। কিন্তু এর পর হ্যান্ডব্রেকও যখন কাজ করল না, তখন আশঙ্কায় রীতিমতো ঘামতে শুরু করলাম। গাড়ির উজ্জ্বল হেডলাইটের আলোয় রাস্তা দেখে কোনেওরকমে প্রথম বাঁকটা পেরোলাম। এরপর প্রায় খাদে পড়তে পড়তে কোনওভাবে দ্বিতীয় বাঁকটাও পেরোনো গেল। এখন এক মাইল সোজা রাস্তা—তারপর তৃতীয় ও শেষ বাঁক। এই বাঁকটা কাটাতে পারলে এ যাত্রা বেঁচে যাব—কেন না, এরপর আমার বাড়ির রাস্তাটা একটু চড়াইয়ের মতো, গাড়ির গতি আপনা আপনি কমে যাবে।

এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও পার্কিনস্ ছিল সতর্ক ও তৎপর। মাথা একদম ঠান্ডা। ও বলল,—স্যর, এভাবে কিন্তু আমরা শেষ বাঁকটা কাটাতে পারব না, গাড়ি অবশ্যই খাদে পড়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার পরেই পার্কিনস্ ইঞ্জিনের সুইচ অফ্ করে দিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও গাড়ি অসম্ভব দ্রুতগতিতে গড়িয়ে চলল। তখন পাশের সিট থেকে হাত বাড়িয়ে স্টিয়ারিং হুইলটা সামলাতে সামলাতে পার্কিনস্ বলল,—স্যর, এই শেষ বাঁকটা আমরা কিছুতেই কাটাতে পারব না। আপনি বরং গাড়ির দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ুন।

আমি বললাম,—না! দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী হয়! তোমার ইচ্ছে হলে তুমি লাফাতে পারো।

—না, স্যর, আমিও তাহলে আপনার সঙ্গেই থাকব। বলল পার্কিনস্।

এটা যদি আমার পুরোনো গাড়ি হত, তাহলে গাড়িটা রিভার্স গিয়ারে দিয়ে গিয়ার বক্স জ্যাম করে একটা সুযোগ নিতে পারতাম। কিন্তু এই গাড়িতে তা করা গেল না। পার্কিনস্ আমার জায়গায় ড্রাইভারের সিটে চলে আসার চেষ্টা করেও পারল না—যে গতিতে গাড়ি চলেছে, তাতে সেটা সম্ভব হল না। স্টিয়ারিং থেকে যেন কীরকম শোঁ শোঁ করে আওয়াজ হচ্ছে আর বিশাল ঝকঝকে নতুন গাড়িটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করে তীব্রগতিতে চলেছে। হেডলাইট জ্বলছে উজ্জ্বলভাবে। পলকের জন্য আমার মনে হয়, উলটোদিক থেকে যদি কোনও মানুষ বা বাহন আসে, আমাদের এই গাড়ি তাদের কাছে হবে মৃত্যুর উজ্জ্বল পরোয়ানার মতো।

তৃতীয় বাঁকটা কাটানোর সময় গাড়ির একটা চাকা মুহূর্তের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য খাদের ওপর ঝুলে থাকলেও খাদে না পড়ে কোনওরকমে আমরা বেঁচে গেলাম। এবার খালি একটা পার্কের গেট, যার ভিতর দিয়ে আমার বাড়ি যাব। কিন্তু গেটটা আমাদের ঠিক সামনে নয়, আমাদের এই রাস্তা থেকে বাঁদিকে বিশ গজ দূরে। স্টিয়ারিং হুইলটা ঠিকমতো ঘুরিয়ে নিশ্চয়ই ওই গেটের কাছে পোঁছোতে পারতাম। কিন্তু তৃতীয় বাঁকটা কাটানোর সময় সম্ভবত স্টিয়ারিংটা খারাপ হয়ে গেছল—সেটা আর ঠিকমতো ঘোরানো গেল না।

প্রাণপণ চেষ্টা করেও যখন গাড়িটাকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখা গেল না, তখন আমি আর পার্কিনস্ দুজনেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লাম। পরমুহূর্তেই পঞ্চাশ মাইল স্পিডে চলতে থাকা ওই গাড়ি গিয়ে ধাক্কা মারল পার্কের গেটের ডান দিকের থামে। সংঘর্ষের আওয়াজটা স্পষ্ট শুনতে পেলাম। আর আমি? আমি তখন হাওয়ায় ভাসছি। কিন্তু—তারপর—তারপর কী হল?

পরে যখন আমি আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আবার সচেতন হলাম, তখন দেখি রাস্তার ধারে একটা ওক গাছের নীচে ঝোপের মধ্যে পড়ে আছি। একটা লোক আমার পাশে দাঁড়িয়ে। প্রথমে মনে হল, লোকটা বোধহয় পার্কিনস্। তারপর লোকটাকে চিনতে পারলাম—আমার কলেজ জীবনের প্রিয় বন্ধু স্ট্যানলি। আমাদের দুজনের মধ্যে ছিল গভীর বন্ধুত্ব। এই সময়ে এবং এই পরিস্থিতিতে ওকে হঠাৎ দেখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়ে একটু অবাক হলাম। কিন্তু তখন আমার যা অবস্থা—বিপর্যস্ত, আচ্ছন্ন ভাব—সবকিছুই স্বপ্নের মতো লাগছে। যা দেখছি, বিনা প্রশ্নে বা সংশয়ে তাই মেনে নিচ্ছি।

আমি বললাম,—ও! কী সাংঘাতিক অ্যাক্সিডেন্ট!

স্ট্যানলি মাথা নাড়ল। ওর মুখে আগের মতো সেই স্বচ্ছসুন্দর মৃদু হাসি।

আমি নড়াচড়া করতে পারছিলাম না। নড়াচড়া করার ইচ্ছেও ছিল না। কিন্তু আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ। দেখতে পাচ্ছিলাম, কিছু লোক হাতে লণ্ঠন নিয়ে গাড়িটার ভগ্নাবশেষের গাছে দাঁড়িয়ে নীচু গলায় কথা বলছে। চিনতে পারলাম ওদের। বাড়ির দারোয়ান, তার বউ আর দু-একজন। ওরা কেউ আমার দিকে তাকাচ্ছিল না, গাড়ি নিয়েই ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ যেন কেউ যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল।

একজন বলল,—পুরো গাড়িটার ওজন ওর ওপর পড়েছে। খুব আস্তে করে গাড়িটাকে তুলে ধরো।

—এটা আমার পা! কে যেন বলে উঠল। গলাটা চিনতে পারলাম—পার্কিনস্ কথা বলছে।

—স্যর কোথায়? বলে চেঁচিয়ে উঠল পার্কিনস্।

—এই তো আমি এখানে। আমি উত্তর দিলাম। কিন্তু কেউ আমার কথা শুনতে পেল না। সবাই গাড়ির সামনে ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছিল।

স্ট্যানলি আলতো করে আমার কাঁধে হাত রাখল। আঃ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি আরাম ওর স্পর্শে। আমার ভারী ভালো লাগল।

—ব্যথা-ট্যথা নিশ্চয়ই নেই, কী বল? স্ট্যানলি জিগ্যেস করল।

—না, না। একদম ব্যথা নেই। আমি বললাম।

—হ্যাঁ, সেটাই তো স্বাভাবিক। ব্যথা একদম থাকে না। বলল স্ট্যানলি।

এবং তখন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আমার মনে পড়ে গেল—স্ট্যানলি! স্ট্যানলি! ও তো অনেকদিন আগে আন্ত্রিক রোগে মারা গেছে, সেই বুয়র যুদ্ধের সময়।

কান্নায় অবরুদ্ধ গলায় ওকে আমি বললাম,—ভাই স্ট্যানলি! তুমি তো বেঁচে নেই!

স্ট্যানলি ওর সেই সহজ সুন্দর হালকা হাসি হেসে বলল,—তুমিও।

'How it happened' গল্পের অনুবাদ

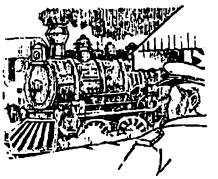

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশটি গা ছমছম জমাট রহস্য...'কাঁটা হাত',
'বন্ধ ঘরের রহস্য', 'প্রতিশোধ', এবং...,
যেখানে অলৌকিক-বিজ্ঞান-রহস্য
মিলেমিশে অনবদ্য!

INR 120.00
9 788183 741453
www.bookspatrabharati.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~